অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

উয়িনিচের অজানা ভাষা ও আরো বারো



ভয়নিচের অজানা ভাষা
ও আরো বারো

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

Bhainicher Ajana Bhasha O Aro Baro
(A collection of Bengali stories)
Code : 72 B 32

Dev Sahitya Kutir (Pvt.) Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
WWW.Devsahityakutir.com
E. Mail : dev_sahitya@rediffmail.com
Tel : 2350-4294/4295/7887

ISBN : 978-93-5060-105-1

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১, ঝামাপুকুর
লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে শ্রী রাজর্ষি মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক
বি. পি এম'স প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর,
দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪ পরগনা
থেকে মুদ্রিত।

বর্ণসংস্থাপন ঃ মেগাবাইট, ১০ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ দেবাশিস দেব

উপন্যাসের অলংকরণ ঃ অনুপ রায়

দাম ঃ ২০০.০০ টাকা

প্রকাশকের কথা

মূলত শিশু-কিশোরদের জন্য লেখালেখির মাধ্যমেই সাহিত্যজগতে তাঁর আগমন। তবে বর্তমানে ছোট বড় সকলের কাছেই তিনি সমান জনপ্রিয়। রহস্য, ভৌতিক, কল্পবিজ্ঞান, সামাজিক, মানবিক, প্রেম—এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে গল্প ও উপন্যাস লিখে চলেছেন। শুকতারার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। এই বছর থেকে দেব সাহিত্য কুটীর-এর গ্রন্থ বিভাগের সঙ্গেও তাঁর নাম সসম্মানে সংযুক্ত হল।

নমস্কারান্তে

বইবেলা ২০১৭ রূপা মজুমদার

ভূমিকা

এই নামটা লেখার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে উঁকিঝুঁকি মেরে গেল কয়েকটা শব্দ, যেমন—কল্পবিজ্ঞান, অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য, অলৌকিক, অনিলিখা।

আপনাদেরও কি তাই হল?

যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে বলুন তো, আমরা কি মানুষটির প্রতি সুবিচার করলাম?

আমার মনে হয়, শুধুমাত্র উপরোক্ত ওই ক'টা শব্দ বা তার সঙ্গে জড়িয়ে রাখা অনুভব দিয়ে মানুষটির লেখার প্রকৃত মূল্যায়ন করা যায় না।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী এমন একজন লেখক, যিনি শিশু-কিশোর সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর ফিকশন-কে যথাযথ গুরুত্বই শুধু দেননি, বরং, যে শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধকে প্রায়ই অবজ্ঞাভরে পেছনের সারিতে ঠেলে দিয়ে রহস্য-রোমাঞ্চ-অলৌকিক-কে সামনে এগিয়ে এনে নজর কাড়তে চান অনেকে, সেই মূল্যবোধকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন তিনি তাঁর প্রতিটি লেখায়।

তাঁর কল্পবিজ্ঞান কাহিনির কেন্দ্রে থাকে কোনো অসহায়ের চোখের জল মুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। তাঁর রহস্য কাহিনির লক্ষ্য হয় কোনো শূন্য বুকে হারিয়ে যাওয়া পাখিদের ফিরিয়ে দেওয়া। আর তাঁর অলৌকিক কাহিনি বলে, রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

ঠিক সেই জন্যেই, যে বইটা এখন আপনারা হাতে তুলে নিয়েছেন, সেটা খুব-খুব স্পেশাল।

এই বইয়ে যে লেখাগুলো আছে সেগুলোর প্রত্যেকটা, তাদের গায়ে যে রঙের পোশাকই থাকুক না কেন, আসলে বিশুদ্ধ মানবিক মূল্যবোধের।

এদের কোনোটা আপনাকে ভয় পাওয়াবে, কোনোটা ভাবাবে, কোনোটা চোখের কোণাকে নরম আর ভেজা-ভেজা করে দেবে, কোনোটা নিজের অজান্তেই আপনার নজর সরিয়ে দেবে জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া এক-ফালি আকাশের দিকে, কোনোটা বুকের একেবারে ভেতর থেকে তুলে আনবে একটা মস্ত বড়ো শ্বাস।

কিন্তু, এদের প্রত্যেকটাই আপনাকে, এক মুহূর্তের জন্যে হলেও, নিয়ে যাবে ঠিক সেই বিন্দুতে, যেখানে সামনে মাথা তোলা সংকট বা দ্বিধার মোকাবিলা করতে হবে আপনাকেই।

তাহলে আর দেরি করা কেন?

আসুন, লেখকের বাড়ানো হাত ধরে ঢুকে পড়া যাক তাঁর, এবং আপনার অন্তরমহলে। পাঠ শুভ হোক।

ঋজু গাঙ্গুলী

সূচীপত্র



ভয়নিচের অজানা ভাষা

রাজর্ষি। আমি ওকে রাজু বলে ডাকতাম। ও ছিল অনেকটাই আমার মতো। আমার মতো একা। চুপচাপ। আমার স্কুলের সবথেকে প্রিয় বন্ধু। স্কুলের বেশিরভাগ সময়টাই আমার কাটত ওর সঙ্গে।

অবশ্য আমরা যে শুধু স্কুলেই একসঙ্গে থাকতাম, তা নয়। স্কুলের পরে রোজই আমরা হাঁটতে হাঁটতে হয় পুকুরধারে গিয়ে, না হয় আমবাগানে, না হয় বটতলার মাঠে গিয়ে বসতাম। মাঝে-মধ্যে ও যেন অন্য একটা জগতে হারিয়ে যেত। পুকুরের ধারে বসে জলের মধ্যে ব্যাঙাচিগুলোর লাফালাফি দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে যখন রোদ্দুর গড়িয়ে আসত, ও তখন অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকত। মনে হত যেন কারুর ম্যাজিক শো দেখছে। আমি কিছু কথা বলতে গেলে ঠোঁটে আঙুল তুলে আমাকে কথা বলতে বারণ করত। আর উপরে গাছের দিকে দেখাত। আর সত্যি করেই তখন যেন ওর মতোই মুহূর্তের মধ্যে ওর চোখে অন্য জগৎটাকে দেখতে পেতাম। ধরা দিত সেই চোখের সামনের অজানা জগৎ।

গাছের পাতায় বিছিয়ে রাখা মাকড়সার জালে আটকে থাকা জলের ফোঁটা মুহূর্তে যেন মুক্তো হয়ে উঠত। পাতার উপরে হাত-পা তুলে নাচতে থাকা ছোট কালো পোকাকে দেখতে পেতাম। খানিক দূরে সবুজ পাতার উপরে ঝিমিয়ে

পড়ে থাকা ফড়িংটার মনের ভাব বুঝতে পারতাম। তিরতির করে হাওয়ায় কাঁপতে থাকা পাতাগুলোর মধ্যের কথাও যেন শুনতে পেতাম। সেই সুরেলা শব্দের আড়ালে চড়ুই, দোয়েল, ঘুঘুর ডাকও যেন হারিয়ে যেত। ওদের সুরের সঙ্গে তাল মেলানো হলুদ ঘাসফুলের মাথা নাড়া চোখে পড়ত। উপর থেকে ফুলের পাপড়ি নেমে আসত। আমাদেরকেও যেন ওদের উৎসবে কিছুক্ষণের জন্য সামিল করে নিত।

কখনো বা আমরা বটতলার মাঠের পাশে বসে একসঙ্গে খেলা দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম। আমি নিজে খেলতে পারতাম না। আর ওর নিজের খেলার আগ্রহ ছিল না। গোল হলে সে যে দলেরই হোক না কেন আমরা দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠতাম। আমাদের মতো একনিষ্ঠ দর্শক পেয়ে যে কোনো দলই খুশি হত তা বলাই বাহুল্য। খেলা শেষ হলে ওরা যখন মাঠ থেকে বেরোত, আমি ওদের কাছ থেকে বলটা কয়েক মিনিটের জন্য চেয়ে নিতাম। বলটা হাতে ছুঁয়ে কি যে ভালো লাগতো বলে বোঝাতে পারব না। মাঝে-মধ্যে স্বপ্ন দেখতাম আমিও ওদের মতোই বল নিয়ে ছুটে যাচ্ছি। একের পর একজনকে কাটিয়ে গোলে শট। গোল! ঘুম ভেঙে রোজ মন খারাপ হয়ে যেত। জানি আমি ওদের মতো কোনোদিন ভালো খেলতে পারব না।

আরেকটা দিকেও আমাদের মিল ছিল। দুজনেরই স্কুল বিশেষ ভালো লাগত না। নিয়মমাফিক কিছুই ভালো লাগত না। তবে আমি পরীক্ষায় শেষের দিকে থাকলেও ও কিন্তু বেশ ভালো রেজাল্ট করত। বরাবর ফার্স্ট হত। কী করে করত, সেটা বুঝতে পারতাম না। মাঝে-মধ্যে মনে হত আগে থেকেই ও যেন সব কিছু জানে।

ওর বাবা-মা ছিল না। মাইল পাঁচেক দূরের একটা অনাথ আশ্রমে থাকত। ওখানে কাছাকাছি স্কুল না থাকায় আমাদের এই স্কুলে ও অনেকটা হেঁটে পড়তে আসত। অন্যদের মুখে শুনেছিলাম ওর যখন দিন দশেক বয়স কে যেন ওকে গ্রামের চার্চের বাইরে কাপড়ে মুড়ে রেখে গিয়েছিল। ওখানকার ফাদার মোজেস ওকে কুড়িয়ে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেন। ওখানে ও অনাথ আশ্রমের অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মানুষ হলেও ও কিন্তু ছিল একদম অন্যরকম। সবসময় একটা অজানা আনন্দে যেন বিভোর থাকত। আর মাঝে-মধ্যে নিজের মনে বিড়বিড় করে হেসে বলে উঠত, ভারী মজা।

জিগ্যেস করলে বলে উঠত, শুনলি না, কি বলে গেল।

কে?

ওই যে, বলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখাত। দেখতাম দূরে কোনো পাখি উড়ে যাচ্ছে। আমি ওকে অবাক হয়ে জিগ্যেস করতাম, রাজু, তুই কি ওদের কথা বুঝতে পারিস?

না, এখনও পারি না, তবে শেখার চেষ্টা করছি। শুধু মজার কথাগুলো যখন ওরা নিজেদের মধ্যে বলে আর নিজেদের মধ্যে ছোটছোট ব্যাপারে ঝগড়া করে, তখন ওদের হাবেভাবে যেন একটু একটু বুঝতে পারি। বলে থেমে যেত। আবার যেন কিসের ভাবনার মধ্যে হারিয়ে যেত।

২

ও যে অন্যরকম, বলতে গেলে একদমই অন্যরকম, আস্তে আস্তে সেটা টের পেলাম।

আমার মনে হত সব কিছুই যেন ও আগে থেকে জানে। কিন্তু প্রকাশ করতে চায় না। তখন আমরা ক্লাস ফাইভে পড়ি। আমাদের নতুন একজন অঙ্কের টিচার এলেন স্কুলে। সৌজন্যবাবু। সৌজন্য পাত্র।

কয়েকদিনের মধ্যেই ওনার একটা ডাকনাম আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে উঠল। শূন্য। এর কারণ ওনার কাছে যেকোনো পরীক্ষায় ভালো, খারাপ সব ছাত্রেরই একই অবস্থা হত। সবথেকে কম মার্কস শূন্য, সবথেকে বেশি মার্কসও শূন্য। আর উনি তা দেখে যেন ভারী তৃপ্তি পেতেন। নাম্বার বলার সময় ঠোঁটের কোণে একটা হাসি লেগে থাকত। আর সে আনন্দ পাওয়ার জন্যই কি না জানি না, মাঝে-মধ্যেই পরীক্ষা নিতেন ক্লাসে।

তা উনি একদিন আমাদের ক্লাসে বেশ কিছু শক্ত শক্ত অঙ্ক দিলেন। সবার মতো রাজর্ষিও শূন্য পেল। কিন্তু রেজাল্ট দেওয়ার সময় সৌজন্যবাবু ওকে আলাদা করে ডাকলেন। ওর খাতা দেখে সৌজন্যবাবু ক্ষেপে আগুন। আমরা একটু অবাক হলাম। কারণ শূন্য পাওয়ার জন্য তো আর ওর উপরে ওনার রাগ হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেটাই নিয়ম।

ওকে সামনে ডেকে নিয়ে উনি চেঁচাতে শুরু করলেন।

—বলি এটা কি ইয়ারকি হচ্ছে? তোমার সম্বন্ধে তো অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছিলাম। তা তোমারও এই অবস্থা। এটা কী? অঙ্ক চেষ্টা করে পারোনি এক কথা, আর এসব হাবিজাবি লিখে রাখা আরেক কথা। অঙ্ক না করে এসব কী লিখেছ? বলি কবি হওয়ার ইচ্ছে থাকলে বগলে খাতা নিয়ে এখনই রাস্তার ধারে বেলতলায় গিয়ে বসতে পার।

বলে উনি আমাদের সবাইকে শুনিয়ে পড়তে শুরু করলেন, প্রথম অঙ্কের উত্তরের জায়গায় তুমি লিখেছ—

যে সব লোকে পদ্য লেখে
তাদের ধরে খাঁচায় রেখে
কানের কাছে নানান সুরে
নামতা শোনায় একশো উড়ে
সামনে রেখে মুদির খাতা
হিসেব কষায় একুশ পাতা।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমাদের দিকে একবার কড়া চোখে তাকিয়ে উনি ফের বলে উঠলেন, তাও নিজের কবিতা হলে বুঝতাম। মুর্খ হয়ে সুকুমার রায়ের কবিতা লিখলে চলবে সারাজীবন?

আসলে সৌজন্যবাবু ছিলেন উড়িষ্যার লোক। আমাদের মতো উনিও ভেবেছিলেন ওনাকে নিয়ে ঠাট্টা করেই রাজর্ষি বোধহয় এটা করেছে। 'উড়ে' বলে লিখেছে।

আমি নিজে একটু অবাকই হয়েছিলাম। কারণ কাউকে অপমান করে কোনো কিছু করতে ওকে কোনোদিন দেখিনি। সব শিক্ষকদের ও দারুণ শ্রদ্ধা করে। হঠাৎ করে এটা ও করতে যাবে কেন!

সৌজন্যবাবু ফের হুঙ্কার করে উঠলেন, কী ব্যাপার? কী জন্য এসব রাবিশ লিখেছিলে?

রাজর্ষি মাথা নিচু করে বলে উঠেছিল, আসলে উত্তরটা ২১ এসেছিল, তাই ওই কবিতাটার কথাই মনে এসেছিল। তাই লিখে ফেলেছিলাম।

আমরাও সবাই বুঝলাম—ওই একুশে আইনের কবিতাটা লেখার মূল কারণ। ওই অঙ্কের উত্তর ও পেয়েছিল একুশ। আর একুশ-ই ছিল ওই শক্ত অঙ্কটার ঠিক উত্তর।

সৌজন্যবাবুর মুখ যেন আনন্দে একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

উনি ফের বলে উঠলেন, তার পরের অঙ্কটার উত্তরে 'জল' লিখেছ। সেটা আবার কী? এর থেকে জলে ঝাঁপ দিলে ভালো করতে।

—আসলে উত্তরে ১৮ এসেছিল। ওটা জলের মলিকিউলার মাস নাম্বার বা ভরসংখ্যা। তাই জলের কথা মনে এল।

আমরা ক্লাস ফাইভে কেউই তার অর্থ বুঝিনি। তখন আমরা এসব কিছুই পড়িনি। পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু স্যার তখন বুঝেছিলেন। ওই উত্তরটাও ঠিক। আর তাই আরও অবাক হয়ে ওর ঘাড়ে সস্নেহ হাত রেখে পরের প্রশ্নের উত্তরের ব্যাখ্যা জিগ্যেস করেছিলেন।

পরে দেখা গেল সব কটা অঙ্কের উত্তরই ঠিক। আর সব কটা অঙ্কের উত্তরই ও ভালোমতো কষে বার করেছে পিছনের পাতায়।

সৌজন্যবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। ওনার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। আর শুধু তাই নয়, সংকেতের মাধ্যমে এমনভাবে লিখেছে যে অনেক পণ্ডিত লোকও সে সংকেতের অর্থ বুঝতে হিমশিম খাবে। এখানে বলে রাখি সেদিনের বেশিরভাগ অঙ্কের প্রশ্নই ছিল অনেক উঁচু ক্লাসের।

পরে একদিন আমরা যখন বটতলার মাঠে বসে খেলা দেখছি, তখন ওকে জিগ্যেস করেছিলাম ও এত কিছু জানে কী করে!

ও বলে উঠেছিল, জানিসই তো আমি অনাথ আশ্রমে থাকি। ওখানে বেশ কয়েকটা দাদা আছে, যারা উঁচু ক্লাসে পড়ে। আমি মাঝে-মধ্যেই ওদের বইগুলো নিয়ে বসে যাই। নাড়াচাড়া করি। অনেক কিছু জানা যায়।

—তা তোর এসব শক্ত লাগে না? নিজে থেকে বুঝতে পারিস?

না, শক্ত আর কি? আর তেমন শক্ত লাগলে ওদের জিগ্যেস করে জেনে নি।

কথাটা ও এত সহজভাবে বলেছিল যেন যে কেউ চাইলেই অন্য ক্লাসের বই পড়ে বুঝে নিতে পারে। আমি তো আমার ক্লাসের বই পড়েই বুঝতে পারতাম না।

এসব কথার মধ্যে ও হঠাৎ করে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বলে উঠল—এসব প্রশ্নের উত্তর তো অনেক সোজা। বিষয়টা একটু পড়ে নিলেই সব জানা যায়। কিন্তু অনেক কিছুর উত্তরই তো কোনো বইতে লেখা নেই। আর সেসব উত্তরই তো আমি খুঁজছি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এমন কী থাকবে, যা বইতে নেই? বড়দের বইতেও নেই!

ও উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল, আয়, তোকে দেখাই। বলে মাঠের থেকে কিছু দূরে পার্থদের বাড়ির কাছে একটা বুড়ো হিমসাগর আমগাছের সামনে নিয়ে গেল আমাকে। জিগ্যেস করল, দেখতে পাচ্ছিস ওদের?

—কাদের?

—আরে ওই ছোট ছোট লাল পিঁপড়েগুলোকে দেখ। সার বেঁধে কিরকম উঠছে। মাটির দিকে দেখিয়ে ও বলে উঠল, ওই ওখানে ওদের গর্ত। সেখান থেকে কিরকম সার বেঁধে গাছের উপর অব্দি উঠে গেছে। এবার একটা মজা দেখ। আমি ওদের যাওয়ার পথে সামান্য একটু বাধার সৃষ্টি করব।—বলে খানিকদূরের টিউবওয়েল থেকে হাতে করে খানিকটা জল নিয়ে এসে মাটির উপরে ওদের পথে ফেলে দিল। খুব সাবধানে সামান্য জল ফেলল যাতে একটাও মারা না যায়। কিছু পিঁপড়ে শুধু ভেসে চলে গেল। খানিক বাদে ওরা আবার অন্য পথ দিয়ে ওই আমগাছের দিকে এগিয়ে গেল।

আমাকে এবার ও বলে উঠল—কী বুঝলি কি হল?

—কী আবার? কয়েকটা পিঁপড়ে জলে ভেসে গেল আর তার পরে ওরা অন্য পথে এগিয়ে গেল।

রাজু হেসে উঠল। বলে উঠল, তুই সবই দেখেছিস। কিন্তু এটা ওরা কী করে করল তা ভাবিসনি। কয়েকটা মাত্র পিঁপড়ে আক্রান্ত হল আর সঙ্গে সঙ্গে সে খবর চলে গেল অন্যদের কাছে।—গর্তের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল,

ওই যারা ৪ ফুট দূরে আছে তাদের সবার কাছেও ওই খবর চলে গেছে। এমনকি যে পিঁপড়েগুলো গাছের উপরে আছে, তাদের কাছেও খবর চলে গেছে। এটা কি করে সম্ভব হল বল তো? ওরা নিজেদের মধ্যে কী সুন্দর কথা বলে দেখেছিস? ওই ভাষা কি আর কোনো বইতে লেখা আছে? ওটাই শিখতে হবে। ভেবে দেখ ওরা কত সুন্দরভাবে একসঙ্গে থাকে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে। তুই এত মানুষকে কখনও একসঙ্গে দেখেছিস? একসঙ্গে একটা কাজ করতে দেখেছিস?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে উঠল, তাহলেই ভাব ওরা কত এগিয়ে আছে! আর কত সুন্দর ওদের ভাষা।

আমি তখনও ওর কথার অর্থ বুঝছিলাম না। এ আর এমন কী শক্ত ব্যাপার! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলে উঠল, চল, এসব এখনই তোর মাথায় ঢুকবে না। আমরা খেলা দেখি গিয়ে।

আমরা আবার মাঠের দিকে ফিরে চললাম।

৩

আমি তখন ক্লাস সেভেনে। হঠাৎ মা মারা গেল। ক'দিনের জ্বরে। মনে হল আমার পৃথিবীটাই যেন বদলে গেছে। মনে হল আমাদের ছোট সংসারটার শিকড় কেউ যেন হঠাৎ করে মাটি থেকে উপড়ে তুলে নিয়েছে। স্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দিলাম। বাবাও তেমন কিছু বারণ করল না। এমনিতেই আমার পড়াশোনা ভালো লাগত না।

বাবার যে ছোট টিমটিমে মুদির দোকানটা ছিল, সেখানে বসতে শুরু করলাম। বাবারও একটু সুবিধে হল। আমি রোজ খাতায় কেনাবেচার হিসেব করে দিই।

আর বেশিরভাগ সময় যখন দোকানে লোক আসে না, তখন উলটো দিকের বটগাছটার দিকে তাকিয়ে পাখিদের খেলা দেখি। বুঝতে পারি রাজুর সঙ্গে থেকে থেকে ওদের ভাষা খানিকটা শিখেছি। ওদের কিছু কিছু কথা যেন বুঝতে পারি। পাখিগুলো যখন গাছে বসতে উড়ে আসে, নিজেদের মধ্যে কথা বলে, তখন ওদের হাবেভাবে, ডানার ওঠানো-নামানোতেই ওদের অনেক কথা বোঝা যায়।

যখন রেগে থাকে, কাউকে আক্রমণ করতে চায়, ডানাটা যেন নীচে নামিয়ে কিছু লুকিয়ে রাখতে চায়। ওদের মধ্যে হাবভাব দেখে ঠিক বোঝা যায় কখন ওরা আসল মারপিট শুরু করবে, কখন শুধুই বা ভয় দেখাতে চায়। কখন মজা করছে, কখন বা বন্ধুত্ব করতে চায়। ওদের দু-একটা পাখি মিথ্যেও ভালো বলে। এই যেমন সেদিন দেখি একটা কাঠঠোকরা পাখি একটা বাবুইকে ভালো বাসা বানানোর জন্য কিসব বুঝিয়ে অন্য একটা গাছে পাঠিয়ে দিল। তারপরে দেখি ওই গাছটার গুঁড়ি ঠুকরে ঠুকরে পোকা বার করে খাচ্ছে। বটগাছটায় কখন কোন পাখি আসে, সে রুটিনটাও আমার মুখস্থ হয়ে গেল।

এভাবে প্রায় একমাস কেটে গেল। স্কুলে না গেলেও রাজুর সঙ্গে রোজই দেখা হত। ও স্কুলের পরে আমাদের দোকানে চলে আসত। তারপর ও আর আমি মিলে ভটচায্যিদের পুকুরধারে গিয়ে বসতাম। মাছধরা দেখতাম। ফাতনার ওঠা-নামা, ভেসে ওঠা। রোদ আর মেঘের আলো-ছায়ার খেলা দেখতাম। আলো আরেকটু কমে এলে বাঁশের কচি পাতা চিবোতে চিবোতে বটতলার মাঠে বসে খেলা দেখতাম।

এ ক'দিন আমার মা চলে যাওয়ার পর থেকে অন্য অনেক কথা হলেও রাজু আমাকে কখনই জিগ্যেস করেনি কেন আমি স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ারও কোনো চেষ্টা করেনি। একদিন হঠাৎ ওই পুকুরধারে বসে বলে উঠল, বুঝলি, ঝড় না এলে গাছের শিকড় শক্ত হয় না। ওই, ওই—সামনের বড় বটগাছটা দেখ। কত বছরের পুরোনো। একশো-দেড়শো বছর তো বয়েস হবেই। কত ঝড়-জল ওর উপর দিয়ে গেছে। আর তাই ও কিরকম শক্ত শিকড় গেড়েছে দেখ। গাছ থেকে ঝুরি নেমে এসে মাটি আঁকড়ে ধরেছে। হাল ছাড়েনি। এটাই আসল শিক্ষা বুঝলি। প্রত্যেকের জীবনেই ঝড় আসা উচিত। তা না হলে অনেক কিছু শেখা যায় না। জীবনের এই অন্ধকারে ঢাকা দিনগুলিই আমাদের আলোর সন্ধান দিয়ে যায়। আমাদের ভাবতে হবে সেই ঝড়ের কাছে হেরে যাব কিনা, নাকি এমন ভাবে তৈরি হব যাতে পরের ঝড়েও কিছু না হয়।

ও পকেট থেকে একটা ছোট কাপড় বার করল। খুব পুরোনো একটা সাদা রুমাল। তাতে সেলাই করে কয়েকটা নকশা আঁকা।

—এটা কি জানিস?

—না। এটা কোথায় পেলি?

—আমাকে যখন চার্চের বাইরে পাওয়া গিয়েছিল, এ রুমালটাও তখন সেখানে পাওয়া গিয়েছিল। আমার মনে হয় এটা আমার মা আমার জন্য রেখে গিয়েছিল। হয়তো এই নক্সাটার অর্থ যখন খুঁজে পাব, তখনই আমার মাকে খুঁজে পাব। আমি যাতে বড় হয়ে আমার মাকে খুঁজে বার করতে পারি সেজন্যই রেখে গিয়েছিল, তাই না?

—ঠিক বলেছিস।

দেখতে পেলাম ওর চোখ ছলছল করে উঠল। ওর চোখে কখনও জল দেখিনি আগে।

একটু থেমে ও ফের বলে উঠেছিল, কালকে আবার স্কুলে চলে আসিস। একটা মজা দেখাব।

—এতদিন বাদে হঠাৎ করে যাব কি করে! সবাই বকবে তো রে! প্রায় একমাস কিছুই তো পড়িনি। সামনেই তো পরীক্ষা।

—আহা, এত ভাবিস কেন। আমি তো আছি। আর এই যে একমাস স্কুলে যাসনি, তাতেও কি কম কিছু শিখেছিস?

সত্যি কথা বলতে আমি তখন এসব কথা বুঝিনি। শুধু আরেকবার মনে হয়েছিল ও অন্যরকম।

আর কী ভেবে জানি না আবার আমি পরের দিন স্কুলে গিয়েছিলাম। সেদিন টিফিনের বিরতিতে হঠাৎ আমাকে বলে উঠল, চল, তোকে যে বলেছিলাম, সেই মজার খেলাটা দেখাই।

বলে স্কুল থেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে আমাকে একটা দেশলাই বাক্স আর একটা ছোট কাগজ দিল। অবাক হয়ে ওটা দেখে বলে উঠলাম, এটা আবার কী?

কাগজটা একটা বড় কাগজ থেকে কাটা। এক ইঞ্চি মতো চওড়া, চার ইঞ্চি লম্বা। ছোট ছোট করে বেশ কয়েকটা বাংলা অক্ষর তাতে লেখা আছে। কিন্তু কিছু কিছু অক্ষরের মধ্যে বেশি গ্যাপ থাকলেও পুরো লেখাতে কোনো অর্থবহ শব্দ নেই।

অচবট চকতল মেকা গাছে লি পি ঠে রনি চে।

ও এবার ওই কাগজটা দেশলাই বাক্সের উপরে জড়িয়ে দিল। আর বলে উঠল, এটা আসলে একটা সাংকেতিক বার্তা। আজ থেকে আমি আর তুই যখন কোনো কথা বলব, এই দেশলাই বাক্সের সাহায্যেই বলব। দেশলাই বাক্স তো যেখানে ইচ্ছে পাওয়া যায়। শুধু মনে রাখবি যেখানে 'ব' অক্ষরটা থাকবে, সেখান থেকে শুরু করবি আর সেটা দেশলাইয়ের পাশের দিকে প্রথম অক্ষর যেন হয়। এটা শুধু এ লেখাটার জন্যই নয়, আমার আর তোর মধ্যে ওটাই হবে কি-ওয়ার্ড। কি, খেয়াল থাকবে তো?

বলে ও ওই আবোলতাবোল অক্ষর লেখা কাগজটা দেশলাই বাক্সের উপর দিয়ে সেভাবে জড়িয়ে দিল।

আর তারপরে বলে উঠল—'ব' অক্ষরটা যেখানে থাকবে, সেখান থেকে শুরু করবি। আর দেশলাইয়ের ঠিক পাশের দুটো দিকে যেটুকু পাবি, সেটুকুই পড়বি। বাকি অংশতে, অর্থাৎ দেশলাই-এর সামনে বা পিছনে যে লেখা থাকবে তা দেখবি না। আর সেটুকু অংশের মধ্যে অর্থপূর্ণ শব্দ খুঁজবি। একই শব্দের দুটো অক্ষরের মধ্যে ফাঁকও থাকতে পারে।

সেরকম করে দেখলাম। তাতে যে তিনটে শব্দ ধরা পড়েছে তা হল—

বটগাছের নীচে।

—বটগাছের নীচে—সে আবার কী?

—চল গিয়ে দেখাই যাক না। এখানে তো একটাই বটগাছ আছে।

এখানে বলে রাখি আমাদের স্কুলের পাশেই একটা খেলার মাঠ, আর সেখানে একটা বড় বটগাছ ছিল। সেখানে গিয়ে ও বলে উঠল, এবার মাটিটা একটু সরিয়ে দেখা যাক।

বটগাছের নীচে কিছুটা জায়গা জুড়ে আলগা মাটি ছিল। যেন কেউ কিছুক্ষণ আগেই খুঁড়ে কিছু রেখেছে। সেই আলগা মাটি খানিকটা সরাতেই আমি আমার পুরোনো ভাঙা টিফিনবক্সটা খুঁজে পেলাম। কিছুদিন আগে দীপু আমার থেকে মজা করে ওটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। কোথায় রেখেছিল জানতাম না। ভারী দুষ্টু ছেলে। সবসময় অন্যদের ক্ষেপিয়ে তবে শান্তি পেত।

বলেছিল, ওই ভাঙা টিফিনবক্সটা এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবে যে আমি আর কোনোদিন খুঁজে পাব না।

—তা তুই কী করে জানলি?

—আরে আমি ওর পিছন পিছন লুকিয়ে এসে দেখে গিয়েছিলাম।

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমার মায়ের গন্ধ এখনও লেগে আছে ওতে। ওতে করেই রোজ মা খাবার দিত।

রাজু শুধু বলে উঠেছিল, দেখলি, আমি আর তুই কিভাবে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতে পারলাম। এই লেখা কাগজ অন্য কারুর হাতে গেলেও সে কিছুই বুঝতে পারত না। তবে আমাদের দুজনের কাছেই একইরকম দেশলাই বাক্স থাকতে হবে। আর জানতে হবে কোন অক্ষরটা থেকে শুরু করতে হবে।

একসময় গ্রিকরাও এরকম ভাবে কোডের মাধ্যমে খুব গোপনীয় তথ্য পাঠাত। শত্রুপক্ষের হাতে গেলেও কেউ কিছু বুঝতে পারত না।

—তা আমরা কি যুদ্ধে যাচ্ছি? আমাদের এসব কোডের কি দরকার পড়বে? আমি হেসে বলে উঠেছিলাম।

ও বলে উঠল—কে জানে কখন দরকার হবে? তবে এ সংকেতের ভাষা হবে শান্তির ভাষা। যদি কোনোদিন খারাপ দিন আসে, ভালো লোকেদের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হয়, সেদিন হয়তো আমাদের এ ভাষারই দরকার পড়বে।

আবার ওর কথা কিছুই বুঝলাম না।

৪

যত দিন যাচ্ছিল আমার মনে হচ্ছিল রাজর্ষি যেন অন্য একটা জগতে হারিয়ে যাচ্ছিল। ও যেন আরও চুপচাপ হয়ে যাচ্ছিল। কথা আরও কম বলত। তাও যা বলত, তা শুধুই আমার সঙ্গে। বেশিরভাগ সময় আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে কাটাত। ওখানে কয়েকটা কম্পিউটার ছিল। ও সারাক্ষণ কী সব সার্চ করে দেখত ওতে। এটুকু শুধু বুঝতে পারতাম যে ও যা দেখত তা খেলার কিছু নয়। আবার পড়ার বই সম্পর্কিত কিছুও নয়।

একদিন ওকে দেখলাম খুব খুশি। বলে উঠল, কাজ ভালোই এগোচ্ছে। আর একটু এগোলেই আমি ওদের ভাষা বুঝতে পারব। তবে যা ভেবেছিলাম, শুধু আমিই না। আমার আগে অনেকেই এ ভাষা শেখার চেষ্টা করেছে। ভাগ্যিস ওই 'ভয়নিচ ম্যানাসক্রিপ্ট'-এর কিছু অংশ নেটে পাওয়া গিয়েছিল। তা না হলে আমি জানতেও পারতাম না। ২০০ পাতার এই বই-এর অর্থ আমেরিকার মিলিটারি ইনটেলিজেন্সও এত বছরে বার করতে পারেনি। এ বই কি নিয়ে লেখা, কেন লেখা তার কারণ গত ৮০০ বছরেও কেউ উদ্ধার করতে পারেনি।

—ভয়নিচ? সেটা আবার কী?

ও একটু হেসে বলে উঠল, তুই অত বুঝবি না। সংক্ষেপে বলতে গেলে এটা একটা সংকেতে লেখা বই। খুব সম্ভবত ১২০০ সাল নাগাদ রজার বেকন নামের এক অসাধারণ প্রতিভাবান ইংরেজ এটা লিখেছিলেন। উনি ছিলেন এককথায় জিনিয়াস। বহু হাত ঘুরে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফের কাছেও এ বইটা যায়। এটা বহু বছর ধরে প্রাগে ছিল। তার পরে এটা ভ্যাটিকানে চার্চের হাতে আসে। সেখান থেকে এটা কেনে উইলফ্রিড ভয়নিচ নামের একজন পুরোনো বই-এর ডিলার। বইটা অসাধারণ। রজা বেকনের সারা জীবনের রিসার্চের ফসল। আমি যা খুঁজছি, তার সম্বন্ধেও খানিকটা তথ্য আছে।

—তা তুই কী করে জানলি? এত বছর কেউ যা পড়তে পারেনি, তা তুই কি করে উদ্ধার করলি?

—আসলে যে কোনো কোড ব্রেক করতে গেলে, যে লিখেছিল তাকে ভালো করে জানতে হয়। সে সময়টাকে ভালো করে বুঝতে হয়। 'কিওয়ার্ড'গুলো ভালো করে বুঝতে হয়। মনে আছে আমার আর তোর মধ্যে যেমন 'ব' অক্ষরটা একটা 'কিওয়ার্ড'। এটা তো অন্য কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই 'কিওয়ার্ড' না জানলে সংকেত উদ্ধার এতো শক্ত হয়ে যায়। আমি ওই বই-এর 'কিওয়ার্ড'গুলো কিছুটা আবিষ্কার করেছি আর সেভাবেই মনে হয় খানিকটা পড়তে পারছি। ইন্টারনেটে বই-এর কিছু জায়গা তুলে দিয়ে সেটা পড়ে উদ্ধার করার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। আর এর জন্য বড়রকম পুরস্কারও ছিল। কিন্তু আমি তো আর সেজন্য বইটা পড়ছি না। আমি পড়ছি যাতে আমি ওদের ভাষা ভালো বুঝতে পারি।

—কাদের ভাষা?

—কাদের ভাষা সেটা তো এখনই বলা যাবে না। পুরো বইটা না পেলে এর অর্থ বুঝতে পারবো, সেটাও এখনই বলা যাচ্ছে না। কিছু কিছু জায়গায় ভালো ল্যাটিন না জানার জন্যও বুঝতে একটু অসুবিধে হয়েছে। আসলে এ বইটা পড়া এত শক্ত কেন জানিস? লেখার সময় পুরো অন্য একটা নতুন হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল, যেটা এ বই-এর বাইরে কোথাও ব্যবহার হয়নি। সেটা খানিকটা ল্যাটিন থেকে নেওয়া, খানিকটা গ্রিক থেকে নেওয়া, খানিকটা একদম অন্য ধরনের। আর সেই হরফটাই আমি উদ্ধার করার চেষ্টা করছি।

—তা এখন ওটা আছে কোথায়?

—আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে ওটা রাখা আছে। আমি একটা পাতার অর্থ খুঁজে বের করে ওদের জানিয়েছি। আর বই-এর আরও কিছু পাতা যাতে আমাকে পাঠানো হয় তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। ওরা আমার কাজে খুব খুশি। তাই আরও কিছু কিছু অংশ পাঠিয়েও দিয়েছে। দেখা যাক কী হয়।

—তাই? কই দেখা আমাকে।

ও আমাকে নিয়ে কম্পিউটারের কাছে গেল। মেইল থেকে একটা ফাইল খুলে দেখাল। তাতে দেখলাম বেশ কিছু গাছ, ফুল-পাতার ছবি। কোনোটাই চেনা গাছ, ফুল বা পাতা নয়। আর তাতে অদ্ভুত সব রঙ। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, খয়েরি। কিন্তু ছবিগুলো এত যত্ন সহকারে সমস্ত ডিটেলসের সঙ্গে আঁকা যে দেখেই বোঝা যায় এটা সামান্য কোনো বই নয়। আর সামান্য কোনো কারণেও লেখা নয়। ছবির মাঝে-মধ্যে লেখাও আছে। ও ফের বলে উঠল, শুনেছি এরকম ১১৩টা সম্পূর্ণ অপরিচিত গাছ, ফুল, পাতার ছবি আছে। তুই বল। আমরা তো কত গাছ দেখেছি। এরকম একটা গাছ কখনও দেখেছি? আসলে একই গাছের থেকে ফুল, ডাল, পাতা নেওয়া হয়নি। বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। তোকে বই-এর অন্য একটা সেকশন থেকে ছবি দেখাই।—বলে ও অন্য একটা ছবিতে গেল।—এটা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সেকশন।

কিছুই বুঝলাম না। কিছু বৃত্ত আঁকা। কিছু মহিলা, পুরুষের ছবি ওই বৃত্তের গায়ে। চাকার মতো দেখতে ছ'টা তারার ছবি।

আমাকে অবাক হয়ে দেখতে দেখে ও বলে উঠল, বহু লোক এটা পড়ে বোঝার চেষ্টা করেছে। পৃথিবীর সেরা ক্রিপ্টোগ্রাফাররাও এর অর্থ বুঝে উঠতে পারেনি। ক্রিপ্টোগ্রাফার মানে বুঝেছিস তো? যারা এরকম সাংকেতিক ভাষা নিয়ে চর্চা, গবেষণা করে। তবে এতে যে খুব মূল্যবান তথ্য লুকিয়ে রাখা আছে তা নিয়ে কারুর কোনো সন্দেহ নেই। আর তাই সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফ প্রচুর মূল্যে তখনকার দিনে এই বই সংগ্রহ করেছিলেন।

—তা পৃথিবীর সেরা সেরা বিশেষজ্ঞরা যেখানে পারল না, তুই পারবি?

ও হেসে বলে উঠল, পারতে তো হবেই। আর এটা জানলেই ওদের ভাষার সন্ধান পাব। এর আসল রহস্য হল এর অক্ষর, কৃত্রিম একটা ভাষা যাকে তৈরি করা হয়েছিল শুধু এই বই-এর জন্য। যে লিখেছে আর যার জন্য লেখা তারা ছাড়া এই কৃত্রিম ভাষা আর কেউ জানত না। এতটা বলে থামল রাজর্ষি।

কথা বলতে বলতেই দেখলাম ও কয়েকজন মহিলার ছবি দেখে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। একদৃষ্টে আবার তাকিয়ে আছে কম্পিউটারের দিকে। শুধু বিড়বিড় করে যেন বলে উঠল, তাই তো এটা তো ভেবে দেখিনি। 'ভদ্রমহিলা'-কে যেন কী বলা হত ল্যাটিনে—ফেমিনা বা ম্যাট্রোনা। তার মানে ওরা কি—আবার যেন কথাটা হারিয়ে গেল। আমি আর কথা না বলে বেরিয়ে এলাম।

ওদিকে আমাদের গ্রাম যেন খুব তাড়াতাড়ি পাল্টে যাচ্ছিল। বেশ কিছু নতুন নতুন লোকের যাতায়াত শুরু হয়েছিল গ্রামে। কেন জানি না তাদের মধ্যে অনেকে আমাদের গ্রামের ভাঙা রাজবাড়ির কাছাকাছি থাকা শুরু করল। দিনে-দুপুরে ওখানে লোক দেখা যেতে লাগল। তাদের মুখ-চোখ দেখলেই মনে হয় চোর বা ডাকাত।

শুনেছিলাম বহু আগে আমাদের গ্রামে নাকি এক খুব বড় রাজা থাকত। সেটা অবশ্য হাজার বছর আগের কথা।

একদিন রাজর্ষিকে এ ব্যাপারে জিগ্যেস করলাম।

ও বলল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। ওরা কেন আসছে জানিস? আমার মনে হয় গুপ্তধনের খোঁজে। লোকগুলোর চেহারা দেখে একটাকেও ভালো মনে হয় না।

আসলে কিছুদিন আগে কাগজে একটা লেখা বেরিয়েছিল এখানকার রাজবাড়ি নিয়ে। এখানে নাকি পাল রাজবংশের রামপাল ও তার পরেও রামপালের পরের কয়েক প্রজন্ম থাকত। রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার বুঝতেই পারছিস। গুপ্তধন থাকার হাই চান্স। তারপর থেকেই ওদের আসা শুরু হয়েছে।

—তা ভালোই তো, ওরা গুপ্তধন খুঁজে পেলে আমাদের গ্রামটার চেহারাই পাল্টে যাবে। কী সুন্দর হত বল তো যদি এখানে ওই গুপ্তধনের টাকায় ভালো হাসপাতাল তৈরি হত। ভালো স্কুল তৈরি হত। আমাদের স্কুলের বিল্ডিংটারও যা অবস্থা কোনো দিন না ভেঙে পড়ে।

—তুই কি ভাবছিস ওরা ওই গুপ্তধন দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষদের জন্য কিছু করবে! ওরা আরও বন্দুক কিনবে, আরও বোমা কিনবে, আরও অনেক লোককে মারবে। ওরা আমাদের দেশের ভালো চায় না।

—তা সেটা তুই কী করে জানলি?

—আমি ওদের কথা লুকিয়ে শুনেছি। সবাই এসেছে গুপ্তধনের সন্ধানে। আর ওরা একই দলের লোক। ওদের একটা বড়ো অংশ সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় এদেশে বড়ো কোন টেররিজমের ঘটনা ঘটাতে চায়। তারজন্য দরকার অনেক টাকা। সেটা ওই গুপ্তধন পেলে সহজেই ওদের হাতে চলে আসবে।

—ওরে বাবা! তোর কী সাহস! তা তোর কী মনে হয়? ওখানে গুপ্তধন সত্যি আছে?

—নিশ্চয়ই ওদের কাছে খবর আছে। তা না হলে কি আর ওরা এমনি এমনি আসত। ওদের সঙ্গে কানাইও আছে।

কানাই হল আমাদের গ্রামের কুখ্যাত গুন্ডা। খুনোখুনি, মারামারি আর যত রকমের খারাপ কাজ হয়, তার মূল পাণ্ডা হল কানাই। বেশিরভাগ দোকান থেকে জোরজুলুম করে নিয়মিত টাকা আদায় করে। কেউ না দিলে দোকান ভেঙে দেয়।

—কী করা যায় বল তো?

—আমরা আর কী করতে পারি। তবে ওদের থেকে দূরে থাকাই ভালো। অত সহজে ওরা গুপ্তধনের সন্ধান পাবে না। এত বছর যা কেউ খুঁজে পায়নি, তা কি অত সহজে যেখানে-সেখানে মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায়!

৫

এর কিছুদিন পরের কথা। চায়ের দোকানে দুটো লোক কথা বলছিল। একটা বেঞ্চির উপরে বসে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে কথা বলছিল। আমি পাশের একটা বেঞ্চিতে বসে একটা সদ্য পাওয়া গল্পের বই-এর পাতা ওলটাচ্ছিলাম। আর অপেক্ষা করছিলাম বিকেলের শেষ আলোর। তখন লাল হয়ে যাওয়া আকাশটা যেভাবে সামনের বড় পুকুরটায় ডুব দেয়, আমার খুব ভালো লাগে। আর তাই মাঝে-মধ্যে মুখ তুলে দেখছিলাম।

—এই ছেলেটা, শোন এদিকে।

হঠাৎ মনে হল পাশের বেঞ্চির লোক দুটোর মধ্যে একজন আমাকে ডাকছে। ওদিকে তাকাতে আঙুল নেড়ে ডাকল।

কাছে যেতে বলে উঠল, আচ্ছা, তোর সঙ্গে যে ওই ছেলেটা থাকে, তার নাকি ভারী বুদ্ধি! তাকে বলিস তো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমরা ওকে একটা কাগজ পড়তে দেব। তার অর্থ বুঝতে পারলে, অনেক অনেক টাকা দেব। তোকেও দেব। পারবে বলে মনে হয়? অবশ্য কাজটা কিন্তু সোজা নয়।

আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম, পারবে না মানে, অবশ্যই পারবে। যাই লেখা থাকুক না কেন ও ঠিক বলে দেবে। ওর প্রচণ্ড বুদ্ধি। যেকোনো সংকেতের অর্থ উদ্ধার করে দিতে পারে।

লোক দুটোর মুখ যেন খুশিতে চকচক করে উঠল। মোটা কালো ভোঁতা মুখের লোকটা শুধু গম্ভীরভাবে বলে উঠল, ঠিকই শুনেছি তাহলে। তাহলে আজকেই ওকে চাই।

উত্তেজনার বশে বলে ফেলেছিলাম। আমার মনটা যেন হঠাৎ করে বলে উঠল ভুল করেছি। ভুল করে ওদের বলে ফেলেছি। সামলাতে বলে উঠলাম, তবে সবসময় যে পারবেই তেমন কোনো কথা নেই।

লোক দুটো একবার আমার দিকে কড়া চোখে তাকাল। তারপরে কিছু কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। দোকানের চায়ের দাম মিটিয়ে চলে গেল।

যা ভয় পেয়েছিলাম, ঠিক তাই।

এর পরে কয়েকদিন রাজর্ষির আর খোঁজ পেলাম না। আমি স্কুলে হেডস্যারকে

জানালাম। উনি আমাকে অঙ্কের স্যার তরুণবাবুর সঙ্গে ওই অনাথ আশ্রমে পাঠালেন।

রাজর্ষি ওখানে নেই। শুনলাম দু'দিন আগে সকালে ওর এক মামা এসে নিয়ে গেছে কয়েকদিনের জন্য। কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি। ওর তো কোনো মামা আছে বলে জানতাম না। কিন্তু আমার কথাতে কেউ তেমন কান দিল না। আসলে ওকে নিয়ে চিন্তা করার কারুর সময় ছিল না। আমি একা পুরো গ্রাম, আশেপাশের এলাকা, যেখানে যেখানে যেতে পারে সব তন্নতন্ন করে খুঁজে এলাম। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না।

তিনদিন বাদে ও আবার স্কুলে এল।

আমি যা ভয় পেয়েছিলাম, ঠিক তাই। ওকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওরাই ধরে নিয়ে গিয়েছিল রাজর্ষিকে। কিন্তু কাউকে জানালে ওকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়েছে। তাই আমার বাইরে একথাটা আর কেউ জানল না। শুনলাম ওরা একটা খুব পুরোনো কাগজ নাকি ওকে দেখায়। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও রাজর্ষি সেটা পড়ে উদ্ধার করতে পারেনি। কয়েকদিন ওরা রাজর্ষিকে আটকে রাখে। পরে ছেড়ে দেয়।

ও যতই বলুক না কেন আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে ও পারেনি। ওকে আরও জিজ্ঞাসা করতে ও শুধু ওর জামাটা তুলে ধরল। দেখলাম সারা পিঠে বেল্ট দিয়ে মারার দাগ। তাকানো যায় না। বলে উঠল, পারলে কি আর এমন ভাবে মার খেতে হত রোজ?

—তোকে ওরা মারত? আমার মাথার মধ্যে যেন হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল।

কিন্তু কেন? তুই ওটা সল্‌ভ না করতে পারলে কী করার আছে?

ও কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—কে? কে মারত তোকে?

—কানাই।

৬

ক্লাস টেনের পরে ও আর পড়াশোনাই করল না। স্কুলে আসা ছেড়ে দিল। অনেকের ধারণা হয়েছিল যে ওর মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে। যে অত ভালো পড়াশোনায়, সে হঠাৎ করে এভাবে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয়!

যার পড়ার কথা ছিল না, সেই আমি কিন্তু ওর উৎসাহেই পড়া ছাড়িনি। মাধ্যমিকে মোটামুটি ভালোই রেজাল্ট করলাম। আর তা নিয়ে ওর কী আনন্দ! আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, জানতাম তুই পারবি।

আমি অভিমানে ওর সঙ্গে মাঝে বেশ কিছুদিন কথা বলিনি। আসলে খুব রাগ হত যে ও হঠাৎ করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল। আমার কোনো কথাই শোনেনি।

তা আমি সে কথা বলতে ও হেসে বলে উঠল, পরীক্ষা দিইনি বটে, তবে পড়াশোনা কিন্তু ছাড়িনি। আমার ওদের নিয়ে পড়াশোনার জন্য অনেক সময় দরকার ছিল। পরীক্ষা দিলে তো আর সে সময় পেতাম না।

—কাদের নিয়ে?

ওর মুখে সেই চিরকালের ছেলেমানুষি হাসি। বলে উঠল, একদিন বুঝবি। তা আমি স্টেশনের কাছে একটা নতুন দোকান খুলেছি। একদিন চলে আয় দেখতে।

—দোকান? কিসের?

—দোকান ঠিক নয়। মাটির উপরে বসছি। ছবি বিক্রির।

—বলিস কিরে? তুই আবার ছবি আঁকতে শিখলি কবে? আর এত কিছু থাকতে ছবি আঁকার শখ আবার কবে থেকে হল?

—আসলে কিছু একটা করে পড়াশোনাটা চালাতে হবে তো! আর টাকা কোথায় পাব! তাই ভাবলাম স্টেশনের সামনে বসে ছবি আঁকলে লোকে দু-একটা কিনবে। এখন আর অনাথ আশ্রমে থাকা যাবে না। একটা ছোট ঘর ভাড়া করেছি। কোনোরকমে দু'বেলার খাওয়াটা চলে গেলেই হয়।

—তা তুই তো আরেকটু পড়াশোনা করে নিলেই ভালো চাকরি পেয়ে যেতিস।

তার পাশাপাশি না হয় এসব করতিস। তোর মতো এরকম একজন ছাত্র পড়াশোনা ছেড়ে দিলে হয়! আমাদের টিচারদের সবার তোর জন্য মন খারাপ।

ও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলে উঠল, আসলে সামনে সমুদ্র থাকলে, তখন আর পুকুরে যাওয়ার ইচ্ছে হয় না। তা সে যাক গে। তুই ছবি দেখতে অবশ্যই আসিস একদিন।

৭

গিয়েছিলাম। তবে বেশ কয়েকদিন বাদে। সেদিন সন্ধে হয়ে এসেছিল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে বসে দেখি ও একমনে এঁকে চলেছে। দুটো নোংরা হাফপ্যান্ট পরা বাচ্চা পাশে বসে আঁকা দেখছে। একজন উবু হয়ে বসে আছে। আরেকজন উপুড় হয়ে প্ল্যাটফর্মের উপরে শুয়ে গালের নীচে হাত দিয়ে ছবি আঁকা দেখছে। যেন এমন ছবি আগে কখনও দেখেনি।

রাজু এত মন দিয়ে আঁকছিল যে আমাকেও খেয়াল করেনি। আমিও চুপচাপ পাশে বসে দেখছিলাম। একটা অদ্ভুত ধরনের ছবি। একটা গাছের ডালের উপর দিয়ে সার বেঁধে বেশ কয়েকটা পিঁপড়ে হেঁটে চলেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছোট ছোট পাতা। ছবিটা এত জীবন্ত, এত সুন্দর রঙের ব্যবহার যে দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। ও যে কবে এত ভালো ছবি আঁকতে শিখল জানি না।

আমাকে দেখে ওর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলে উঠল, যাক, তাহলে রাগ একটু কমেছে। আমি তো ভাবছিলাম তুই আসবিই না বুঝি।

—না, সত্যিই আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। নেহাৎ এদিকে এসেছিলাম, তাই। তা তোর ছবি বিক্রি হয়?

—হ্যাঁ, ওই দিনে দুটো-তিনটে ছবি বিক্রি হয়। তাতেই ভালো চলে যায়। দাম কমই রেখেছি। এখানে তো আর সেরকম বড়লোক কেউ কেনার নেই। তা ছবিগুলো কিরকম হচ্ছে দেখে বল তো!

ওর পাশে আরও বেশ কয়েকটা ছবি ছিল। দেখলাম। অবাক কাণ্ড। বেশিরভাগ সব পিঁপড়ের ছবি। কোনোটায় ফুলের উপরে বসে আছে। কোনোটায় শুধু একটাই পিঁপড়ে খাবার মুখে ধরে আনছে। কোনোটাতে আবার দুটো পিঁপড়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে। একটাতে বেশ কয়েকটা পিঁপড়ে পরপর হাত

ধরাধরি করে দুটো ডালের মাঝের ফাঁকা অংশে একটা ব্রিজ তৈরি করে একটা ডাল থেকে আরেকটা ডালে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সব ক'টা ছবিতেই রঙের অদ্ভুত সুন্দর ব্যবহার। আর তাতে দারুণ সূক্ষ্ম ডিটেলসও ধরা পড়েছে।

একটা ছবি দেখে বলে উঠলাম, পিঁপড়েটা যেন হাসছে বলে মনে হচ্ছে। কী করে এরকম ছবি আঁকলি তুই?

ও দেখলাম খুশি হয়ে নড়েচড়ে বসে বলে উঠল, যাক, আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে তোর একটু দৃষ্টিশক্তি হয়েছে দেখছি। আসলে যে কারুর ছবি আঁকতে হলে তাদের কথা বুঝতে হবে আগে। তা না হলে কি আর আঁকা যায়? তারা মনে মনে কী ভাবছে সেটা কি বোঝানো যায়?

—তা তুই কি ওদের কথা বুঝিস?

—হ্যাঁ, বুঝি না মানে! ওটাই তো শিখতে এত সময় লেগে গেল। ওই যে সামনে দেখ, এখনও একটা বসে আছে। আমার সঙ্গে খনিক আগেও কথা বলছিল।

আমি সত্যি দেখলাম একটা কাঠপিঁপড়ে ও যে ছবিটা আঁকছে তার মাথার কাছে বসে আছে। আর শুঁড় দোলাচ্ছে।

—ও এখন তোকে দেখছে খেয়াল করে। আমার সঙ্গে কথা বলছিস তো। আমি ওদেরকে কিছু কিছু জিনিস শিখিয়েছি। কিভাবে আমরা কথা বলি। কিভাবে আমরা মনের নানান ভাব প্রকাশ করি। হাসলে কী হয়, কাঁদলে কী হয়, হাঁচলে কী হয়—এরকম। এসব শিখতে ওদের সময় লাগবে। তবে একটা জিনিস দেখেছি, একজন শিখে ফেললে ওদের বাকিরাও সেটা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারে। এদের মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে শেখার প্রবণতা খুব বেশি। ও বলে উঠল।



আমার কেমন যেন মনে হল

ও আর স্বাভাবিক নেই। ওর কি সত্যি মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে! তা না হলে এরকম সব কথা বলে! আরও আধঘণ্টা বাদে ওর ওই আঁকা শেষ হল। বাচ্চা দুটো এতক্ষণ কোনো কথা না বলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছবি দেখছিল। আমরা রাজুর বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলাম। স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূর। পাশে একটা ইটের ভাঁটা আছে। ও আর ওখানকার দুজন শ্রমিক একসঙ্গে থাকে একটা ছোট বাড়িতে। কী করে ওর মতো একজন এদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে সেটাই অবাক লাগল।

তা যাই হোক, পরের দিন আবার ওর ছবি আঁকা দেখতে গেলাম। আবার তার পরের দিন। এ ভাবে প্রায় রোজই যেতাম। ভাবতাম এমনিতেও আর পড়ে কি হবে! আমার যা অবস্থা!

বিকেলের দিকে যেতাম আর সন্ধে অব্দি থাকতাম ওর সঙ্গে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছিলাম ও যা আঁকছে তা নেহাৎ ছবি নয়। একটা ভাষা। একটা সাংকেতিক ভাষা। সে ভাষা কে ঠিক বোঝে, তা আমার জানা নেই। তবে কেউ নিশ্চয়ই বোঝে। আর তাই ছবির মধ্যে খুব ছোটখাটো ডিটেলসও এত যত্ন নিয়ে ও ফুটিয়ে তোলে।

ও মাটির উপরে বাবু হয়ে বসে যখন তুলির টানে রং করত, আমি এটুকু বুঝতাম যে ওর আঁকা ছবি পৃথিবীতে আঁকা বাকি সব ছবির থেকে একদম আলাদা। এখানে রং আর রেখায় ও যা আঁকে, তা হল অজানা এক ভাষা, অজানা এক হরফ। ওর ছবি দেখতে রোজই কোনো না কোনো দেড়-দু'বছরের খুব ছোট বাচ্চা এসে বসত। আর আবিষ্ট হয়ে ওকে কোনোরকম বিরক্ত না করে বসে বসে ছবি আঁকা দেখত। তার কারণ কি এই যে ওরা তখনও অন্য কোনো ভাষা শেখেনি? আর তাই প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই আদি অকৃত্রিম ভাষাকে তারা বুঝতে পারে! কে জানে?

আর দেখত পিঁপড়ের দল। অবাক হয়ে দেখতাম যে ও যেখানে আঁকে, সেখানে সেই জায়গায় ওকে ঘিরে পিঁপড়ে আর পোকার সংখ্যা অনেক বেশি। তারা শুধু যে ওর ছবিকে ঘিরে বসে থাকে তাই নয়, ওর হাতে, পায়ে, গায়ে ঘুরে বেড়ায়। আর তাতেও রাজু কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে ঘাড় নিচু করে এঁকে যায়।

ছবি যে একদম বিক্রি হত না, তা নয়। কিন্তু খেয়াল করতাম কিছু ছবি ও বিক্রি করত না। যেগুলো বিক্রি করত, সেগুলো নিছক নানান রকমের জীবজন্তু, গাছপালার ছবি। সেগুলো ওর আঁকতে বেশি সময় লাগত না। কিন্তু তার বাইরে সারাদিন ধরে যে সব ছবি এত যত্ন নিয়ে আঁকত, সেগুলো ও আলাদা করে সরিয়ে রাখত। সেগুলো বিক্রির জন্য ছিল না। সেখানকার রঙ যেন চোখে দেখা রঙ নয়, জীবনের নানান ধরনের অনুভূতির রঙ। আর তাই সে রঙ অচেনা।

একদিন ও দেখলাম একটা ছবি আঁকছে যেখানে একদল লাল পিঁপড়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে যে বৃত্ত, সেটার দু'দিকে দু'রকম রং। পিঁপড়েগুলো যেন কিরকম অদ্ভুত ভাবে অন্য দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকের মুখের প্রকাশ ভিন্ন। ছবিতে দূর থেকে একটা ছোট জলের ধারা গড়িয়ে আসছে। ছবিটা এত সুন্দর, যে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম—এর অর্থ কি?

—এটা হল বিভেদের রঙ। ওদের মধ্যে এখন আলোচনা হচ্ছে কে কোন দলের, কে কোন রঙের। জলের ধারায় অবশ্য সব রঙ মুছে যাবে। সব এক হয়ে যাবে।

ও আমাকে আঁকতে আঁকতে বলে উঠল—জানিস বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, 'যা তুমি ভাবতে পারবে, তাই সত্যি।' কথাটার অর্থ আগে বুঝিনি। এখন বুঝতে পারি।

বলে ও একটা অন্য ছবি বার করে দিল, এটা দেখেছিস?

ছবিটা আগে দেখিনি। একটা লোক উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। খালি গায়ে। আর লোকটার পিঠের উপর দিয়ে সারি সারি পিঁপড়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে কয়েকটা আবার আকাশের দিকে শুঁড় আর দু'হাত তুলে মুখ উপরের দিকে করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন যুদ্ধজয়ের পরে আনন্দে মেতেছে।

—কীরকম লাগল ছবিটা?

—অসাধারণ! কিন্তু লোকটাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে।

ও হেসে বলে উঠল, সবটাই কি আর আমি বলে দেব!

ও ফের বলে উঠল, জানিস, ১৩০০০-এর বেশি পিঁপড়ের প্রজাতি আছে। ওরা আমাদের অনেক আগে থেকে এ পৃথিবীতে আছে। ডাইনোসরদের সময় থেকে। উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু আর সামান্য কয়েকটা দ্বীপ বাদ দিলে ওরা পৃথিবীর বাকি সব প্রান্তে আছে। আমাদের থেকে বহু হাজার গুণ বেশি সংখ্যায় আছে। আর মানুষ যেখানে পৌঁছেছে, সঙ্গে সঙ্গে ওরাও সেখানে পৌঁছে গেছে। এই ধর আর্জেন্টাইন পিঁপড়ে। ওরা আগে থাকত আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে। এখন সেখান থেকে ওরা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে—জাপানে, অস্ট্রেলিয়াতেও পৌঁছে গেছে। আর শুধু পৌঁছেছে যে তাই না! লক্ষ লক্ষ বসতিও তৈরি করে ফেলেছে। আর সেই এক একটা বাসায় হাজারে হাজারে এরা থাকে।

আমার অবাক হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলে উঠল, তুই কখনও পাঁচ কোটি মানুষকে একসঙ্গে একই উদ্দেশ্যে চালিত করতে পারবি? পাঁচ হাজার মানুষকেও একপথে চালিত করতে গিয়ে বড় বড় নেতারা হিমশিম খায়। এরা কিন্তু তা সহজেই পারে। চাইলে পাঁচ কোটি পিঁপড়ে একসঙ্গে যত শক্ত কাজই হোক না কেন একসঙ্গে করে ফেলতে পারে।

—কিন্তু ওরা তো এইটুকু এইটুকু? আমি হেসে বলে উঠলাম।

—তাহলেই ভাব ওদের সুবিধে কত বেশি! যেখানে চায় চলে যেতে পারে। লুকিয়ে থাকতে পারে। সরু সরু ফাটলের মধ্যে দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে। এই যে স্টেশনে বসে আছি, এখানেই একত্রিশ ধরনের পিঁপড়ে আছে। আর সংখ্যায় আছে প্রায় পঁচিশ লাখের মতো। ভেবে দেখ কী হবে যদি এরা আমাদেরকে একসঙ্গে অ্যাটাক করে।

একটু থেমে বলে উঠল, সব থেকে বড় কথা কী জানিস! রজার বেকন যেটা লক্ষ করেছিলেন সেটা ঠিক। আগে পিঁপড়ের এক প্রজাতির সঙ্গে আরেক প্রজাতির সম্পর্ক ভালো ছিল না। আর তাই ওরা নিজেদের মধ্যে সমানে মারপিট করত। কিন্তু তারপরে ওদের মধ্যে আসে উন্নত ভাষা। যে ভাষা খানিকটা তৈরি হয় রজার বেকন-এর হাতেই। ভয়নিচের ভাষা। আমরা সে ভাষা শিখে নিতে পারিনি। কিন্তু ওরা খুব দ্রুত শিখে নেয়। আর তারপর থেকেই ওদের আসল বিপ্লব শুরু হয়। আজকে আফ্রিকায় কী হচ্ছে, সে খবর ভারতে থাকা পিঁপড়েদের কাছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যায়। ওদের দলে কিন্তু মৌমাছি, ভীমরুল এরাও পড়ে। এদেরও একই ভাষা।

—তা তোকে এত কিছু বলছে কে?

—আমিও তো ওদের ভাষা জানি। আর তাই ওদের সঙ্গে আমার সারাক্ষণ কথা চলে।

কী বলব বুঝলাম না। অবাক হয়ে দেখলাম—ছবির লোকটার পিঠের উপরে দুটো পিঁপড়ে দাঁড়িয়ে ঠিক একইভাবে শুঁড় আর হাত নাড়ছে। যেন আমাদেরই দেখিয়ে।

—আচ্ছা লোকটা কে বল তো? ঘাড় ঘুরিয়ে শুয়ে থাকলেও পাশ থেকে যেন খুব চেনা লাগছে। লম্বা জুলফি, ছোট করে ছাঁটা চুল। ঝোলা গোঁফ। চোখের নীচটা বসা।

—তোর তা দিয়ে কী হবে? ছবিতে একজন কাউকে আঁকলেই হল। বলে ও হেসে উঠল।

আমি শুধু দেখলাম শুধু দুটো নয়, আরও লাইন করে বেশ কয়েকটা পিঁপড়ে ওই ছবিটার দিকেই এগিয়ে আসছে।

ও আমাকে বলল, চল, আমি আজকে তোকে খাওয়াব। আজকে ভালোই রোজগার হয়েছে। বলে আমাকে পাশের একটা দোকানে নিয়ে গেল। আমরা সেখানে মুড়ি আর চপ খেলাম।

রাত হয়ে এসেছিল। তাই তারপর আজ আর ওর সঙ্গে ওর বাড়ি না গিয়ে আমার বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

৮

পরের দিন স্কুল ছিল না। বাবার দোকানে বসেছিলাম। হঠাৎ বেলা এগারোটা নাগাদ রাস্তায় হইচই শুনে বাইরে এসে শুনি, কানাই মারা গেছে।

কৌতূহলবশত কানাই-এর বাড়ির কাছে গিয়ে দেখি সেখানে বেজায় ভিড়। ওর দলের প্রচুর লোক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর তারা সবাই খুব উত্তেজিত। কানাই-এর মতো খারাপ লোকেরই শাগরেদের সংখ্যা বেশি হয়। ভালো লোকের এরকম শাগরেদের দরকার হয় না। কানাই কী করে মারা গেছে সেটাই রহস্য। ভোরবেলা উঠতে দেরি হচ্ছে দেখে ডাকতে গিয়ে ওর কাজের

লোক দেখে, মাটির উপরে পড়ে আছে। সাড়া নেই। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হয়। কিন্তু তখনই প্রাণ ছিল না। শুধু নাকি সারা গায়ে লাল লাল দাগ। যেন পোকার কামড়।



আমি ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইনি। কালকের ছবির ওই লোকটাকে কেন চেনা লেগেছিল বুঝেছিলাম। ওটা ছিল কানাই-এরই ছবি। নেহাত কানাইকে বেশি দেখিনি, তাই তখন খেয়াল হয়নি।

ভ্যানে করে স্টেশনে যখন পৌঁছলাম—তখন দেড়টা বাজে।

দেখি রাজু ওই আগুনলাগা রোদেও প্ল্যাটফর্মে বসে একমনে ছবি এঁকে যাচ্ছে। কয়েকটা লোক ওকে ঘিরে ওর আঁকা ছবি দেখছে। তাদের মধ্যে তিনটে ছোট বাচ্চাও আছে। সবে কোনো ট্রেন এসেছে মনে হয়।

আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম।

তারপর একা হলে জিগ্যেস করলাম, কালকের ওই ছবিটা কোথায়?

ও মুচকি হেসে বলে উঠল, নেই। তা তুই কানাইয়ের ওখান থেকে দেখে এলি নাকি?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ও বলে উঠল—কিরকম দেখলি? আমি নিজেও জানি না কিভাবে ওরা আক্রমণ করে। শুধু জানি ওরা দায়িত্ব নিলে ব্যর্থ হয় না। যাক একটা খারাপ লোকের সংখ্যা কমল। আমার ওর উপর কোনো ব্যক্তিগত রাগ ছিল না। কিন্তু ওরা আমাদের দেশের অনেক বড় ক্ষতি করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আর সময় ছিল না।

একটু থেমে ও জামার পকেট থেকে একটা সরু কাগজ বার করে বলে উঠল—এই কাগজটা রাখ। তোকে তো শিখিয়েছিলাম কিভাবে আমার লেখা

সংকেত বুঝতে হয়। ঠিক একই ভাবে এটা পড়বি। বুঝতে পারবি কোথায় রাখা আছে পাল বংশের গুপ্তধন। আগে অবশ্য আরও অনেক শক্ত জায়গায় ওটা লুকোনো ছিল। আমি নিজে ওটা উদ্ধার করে সরিয়ে রাখি। কিভাবে বুঝেছিলাম জানিস?

—কিভাবে? ওই আমাকে দেওয়া কাগজটার মতো?

—না না, এখানে সংকেতের ভাষা অন্যরকম ছিল। বেকেট যেভাবে সাংকেতিক হাইরোগ্লিফস ব্যবহার করতেন—অনেকটা সেরকম স্টাইলেই। বেকেট কে জানিস?

—না, মিশরের কেউ?

—হ্যাঁ, মিশরের। বলতে পারিস পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ক্রিপটোগ্রাফার হলেন বেকেট। উনি মিশরের বিশাল ধনী দ্বিতীয় খুমহোতেপের রাজকোষ রক্ষার ও সমাধি তৈরির দায়িত্বে ছিলেন। উনিই প্রথম প্রচলিত হাইরোগ্লিফসের বদলে সাংকেতিক হাইরোগ্লিফস ব্যবহার করেন। যাতে সবাই না বোঝে তাই দু'ধরনের টেকনিক ব্যবহার করেন। এক, সাংকেতিক ছবির ব্যবহার। যেমন ধর, নৌকোর ছবি—যাকে মিশরীয় ভাষায় বলা হত খেনতে'। উনি ছবিতে যখন নৌকো ব্যবহার করেন, তার অর্থ কিন্তু অন্য। কে অধিকর্তা বা কে মূল বিষয়ের দায়িত্বে আছে তা বোঝাতে উনি নৌকোর ছবি ব্যবহার করেন। এছাড়া আরেকটা টেকনিক ব্যবহার করেন, যাকে বলে 'অ্যাক্রোফনি'। কোনো পশুর ছবি ব্যবহার করে উনি আসলে সেই পশুর নামের প্রথম অক্ষর নির্দেশ করেন। ধরা যাক ষাঁড়—যার মিশরীয় নাম ছিল 'অ্যালেফ'। উনি 'অ্যা' বোঝাতে তা ব্যবহার করেন। বুঝলি? অজগর-এর ছবি এঁকে 'অ' বোঝানোর মতো।

—তা সে নাহয় বুঝলাম। কিন্তু তুই কী করে গুপ্তধন বার করলি?

—রাজা রামপালও একইভাবে সাংকেতিক ছবি এঁকে আর সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করে মোহর ভর্তি ঘড়া মন্দিরের নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমি ওই দুষ্টু লোকগুলোকে কিছুই বলিনি। ওই কাগজে কী লেখা ছিল, কোথায় গুপ্তধন ছিল তা উদ্ধার করতে আমার কোনোই কষ্ট হয়নি। শুধু ওদেরকে বলে দিইনি। কারণ ওরা তো আর সেটা দিয়ে ভালো কোনো কাজ করত না। এখন যেখানে সরিয়ে রেখেছি, সেখান থেকে তোর পেতে কোনো অসুবিধে হবে না। বলতে

প্যারিস আমার সঙ্গে এতদিন থেকে কীরকম কী শিখলি তা পরীক্ষা করার জন্যই সরিয়ে রেখেছি। একজনের কাছে তোর কথা বলে একটা চাবি রেখে এসেছি। বলে ও ফের ছড়ার সুরে বলে উঠল—

কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চারটি টাকা মাসুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশো আনা ট্যাকস চায়—
খুঁচিয়ে পিঠে গুজিয়ে ঘাড়,
সেলাম ঠোকায় একুশ বার।।
—কার কথা বলছি বুঝলি তো?

আমি 'সুকুমার রায়' বলতে গিয়ে মাঝপথে বুঝতে পেরে বলে উঠলাম, সৌজন্য স্যার। ঠিক তো?

ও হেসে বলে উঠল, দারুণ! এই তো শিখে গেছিস। দেখ আমি আর তুই ছাড়া এটা খুব কম লোকই বলতে পারত। তোকে যে কাগজটা দিয়েছিলাম, ওটা থেকে বাকিটা উদ্ধার করতে হবে, ওনার কাছ থেকে চাবি নিয়ে সে চাবি দিয়ে কী খুলবি, কোথায় সেটা লুকোনো আছে, সেটাই লেখা আছে এই কাগজে। বলে ও হাসল।

—কিন্তু এ তো তোর। আমি কী করব ওসব দিয়ে?

—এই তো! আমি টাকা দিয়ে কী করব? আমি তো ওদের ভাষা জানি। আরও নতুন নতুন অনেক ভাষা আমায় শিখতে হবে। আমি জানি তুই ও টাকার ভালো সদ্ব্যবহার করবি। তুই-ই তো বলতিস যে এখানে ভালো স্কুল হলে, ভালো হাসপাতাল হলে কত ভালো হত, তাই না? ভালো হাসপাতাল হলে, ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা হলে তোরও তো পা দুটো স্বাভাবিক হত!

ও একটু থেমে থাকল, তারপরে বলে উঠল, তোকে আরেকটা ছবি দেখাই, কয়েকদিন আগেই আঁকা।

বলে অনেকগুলো ছবির তলা থেকে ও ছবিটা বার করে দিল—একটা ছেলে ফুটবল পায়ে ছুটে যাচ্ছে। মুখটা ঠিক আমার মতো। আমি রোজ যে লাল হাফ হাতা শার্টটা পরি, ঠিক সেটাই পরে আছে। শুধু পা'টা তার একদম স্বাভাবিক। আমার মতো পোলিও আক্রান্ত সরু সরু দুর্বল পা নয়।

আমার চোখ ভিজে উঠেছিল। ছবিটার রং-তুলির দাগ সব আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছিল।

ও বলে উঠল, মনে আছে কতদিন আমরা দুজন বটতলার মাঠে বসে একসঙ্গে খেলা দেখতাম। তোর চোখের সেই স্বপ্ন আমি দেখিনি বুঝি? বারবার তুই গোল হলে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতিস। বল পাশ দিয়ে গেলে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করতিস। আর তারপরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার বসে পড়তিস। আমি তোর সে সব না-বলা কথার ভাষা ঠিক বুঝতাম। এবারে তুই যেদিন খেলবি, আমিও সেদিন নামব। প্রথমবার ফুটবল। কী আর এমন শক্ত হবে বল! আর ওদেরকে বলে দেব। আমাদের হয়ে খেলবে। বিপক্ষ দলের সব প্লেয়ারদের পা কামড়ে দেবে। বেশ হবে, তাই না! ও হেসে উঠল।

আরেকটা ট্রেন এর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। অনেক লোক ওঠানামা করছিল। কিন্তু তাদের কারুর কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না।

ফের ওর গলা শুনলাম, যা তুই ভাবতে পারবি, মনে রাখবি কাল সেটাই সত্যি হতে চলেছে। ঠিক এই ছবির মতো। আমি তো আজও আমার মায়ের রাখা রুমালের নক্সা উদ্ধার করতে পারিনি। কিন্তু আজও আশা ছাড়িনি। হয়তো কোনোদিন পারব। আর তখনই ঠিক খুঁজে নিতে পারব আমার মাকে।

আমি ওর সামনে কাঁদতে চাইছিলাম না। তাই চোখের জল লুকোতে উঠে দাঁড়ালাম। হাতে ভর দিয়ে পা টেনে শরীরটাকে উপরে তুলে আনলাম। আর তখনই আমাকে যেন লক্ষ-কোটির কোনো এক অজানা বাহিনী সমস্বরে বলে উঠল আমার মনের ভাষায়—ছোটো তন্ময়, ছোটো। তুমি পারবে। আমরা তোমার সঙ্গে আছি।

প্রথমবার, হ্যাঁ প্রথমবার মনে হল আমিও ছুটতে পারি।

"Everything you can imagine is real"--Pablo Picasso.

——

আলো-ছায়া

প্রত্যেকেই কোনো না কোনো জিনিষকে ভয় পায়। কেউ আরশোলায়, কেউ বাঘ, কেউ সাপে, কেউ বা ভূতে। আর আমি? হ্যাঁ, আমিও কিছু জিনিসকে ভয় পাই। তার মধ্যে একটা হল রকিং চেয়ার। দেখলেই মনে হয় চেয়ারে কে যেন বসে আছে। অথচ দেখা যাচ্ছে না। আর তাই রকিং চেয়ারটা না থেমে দুলে যাচ্ছে। এই এক মুহূর্ত আগেই কে যেন বসে ছিল, আর তার পরমুহূর্তেই সে যেন আর বসে নেই।

জানি না এটাকে আমার রকিং চেয়ার ফোবিয়া বলব কিনা। এটা আগে ছিল না। দু'বছর হল হয়েছে। কেন হল সেটা বোঝাতে গেলে সেই ঘটনা দিয়েই শুরু করতে হয়।

তখন মাস ছয়েকের জন্য অফিসের কাজে ইংল্যান্ডে গেছি। শহরটার নাম চেলতেনহ্যাম। পুরোনো বর্ধিষ্ণু শহর। শহর জুড়ে ভিক্টোরিয়ান আমলের বাড়ি। অক্সফোর্ডও বেশি দূরে নয়। তাই শহরে বহু শিক্ষিত মানুষের বাস। ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটা বড় বড় ফেস্টিভ্যাল, যার মধ্যে সাহিত্য উৎসব আর বিজ্ঞানের উৎসবও পড়ে, এখানেই হয়। আর একটা বিখ্যাত ঘোড়ার রেসও হয় শহরটাতে। আর তা দেখতে দেশবিদেশ থেকে অনেক লোক আসে।

কর্মসূত্রে চেলতেনহ্যামে তখন মাস তিনেক হয়ে গেছে। শহরের প্রান্তে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করে থাকি। অফিস শহরের কেন্দ্রে। ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ শহরের মতো এখানেও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বেশ ভালো। তাই গাড়ি কিনতে হয়নি। বাসেই অফিস যাতায়াত করি। শীতের সময়। দিনের বেলা সূর্যের দেখা মিলতে মিলতে আটটা বেজে যায়। আবার বিকেল চারটে বাজতে না বাজতে ঝুপ করে ডুব মাকে। আর তাছাড়া বেশিরভাগ সময় মেঘলা আর তার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ছুটির দিনগুলো তাই ঘরেই বেশি কাটে।

সেদিনটা ছিল বক্সিং ডে। অর্থাৎ ক্রিসমাসের পরের দিন। ২৬শে ডিসেম্বর। রাস্তা শুনশান, ফাঁকা। সবাই বাড়ির ভিতরে। শুধু ক্রিসমাস উপলক্ষে লাগানো ইলেকট্রিক আলোর রোশনাইতে সব বাড়ি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সেদিন আমার অফিস ছুটি। বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। বাস খুব কম। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বাসের দেখা না পেয়ে ঠিক করলাম আর অপেক্ষা না করে হেঁটেই মাইল তিনেক পথ চলে যাব। ঠান্ডা থাকলেও বৃষ্টি নেই। আলোয় সেজে ওঠা বাড়িগুলো দেখতে দেখতে হাঁটা যাবে। গত কয়েক সপ্তাহ শুধু বাড়ি আর অফিস অফিস আর বাড়ি। শহরটাকে আর দেখা হয়নি। সেও আজ আমার মতো একাকী। নির্জন রাস্তায় তাকে আরও কাছ খেতে দেখা যাবে।

তখন রাত আটটার মতো হবে। হাঁটতে হাঁটতে শহরের এক অভিজাত পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। পরপর প্রায় একই ধাঁচের বেশ কয়েকটা ভিক্টোরিয়ান বাড়ি। এগুলো বেশিরভাগ ১৮০০ সালের মাঝামাঝি তৈরি। এ ধরনের পুরোনো বাড়িগুলো সরকার থেকে বিশেষ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। বিশাল বিশাল কাচের জানলা। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বাগান। বোঝাই যায় যারা এসব বাড়িতে থাকে তারা যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। এরকমই একটা বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল বাড়ির সামনের বাগানে রকিং চেয়ারে কে যেন বসে আছে। বাড়িতে কোনো আলো জ্বলছে না। ল্যাম্পপোস্টের আলো এসে পড়েছে লনে। আর তাতেই যা একটু দেখা যাচ্ছে। এই সময় এত ঠান্ডায় অন্ধকারে কোনোরকম আলো না জ্বেলে বাইরে বসে থাকা খুবই অস্বাভাবিক। একটু খেয়াল করে তাকাতেই মনে হল একজন বৃদ্ধা যেন রকিং চেয়ারের উপরে হেলান দিয়ে অজ্ঞানের মতো পড়ে আছেন। আর চেয়ারটা নিজের ছন্দে দুলে যাচ্ছে। ঘুমোচ্ছেন কি? না, তা তো মনে হয় না। ব্যাপারটা যে আদৌ স্বাভাবিক নয়। তা বুঝতে দেরি লাগল না।

বাড়ির বাগানের নিচু গেট খুলে ভেতরে এগিয়ে গেলাম। কাছে এসে ভালো করে খেয়াল করলাম। প্রায় আশির কাছাকাছি বয়েস হবে। বিড়বিড় করে কি বলছেন। কপালে হাত রাখলাম। যা ভেবেছি তাই। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বেহুঁশ হয়ে বাইরে পড়ে আছেন। প্রথমেই এমারজেন্সিতে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকলাম। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসতে আসতে মিনিট কুড়ি লেগে যাবে। ওনাকে তো আর এই ঠান্ডার মধ্যে ফেলে রাখা যায় না। তাই ওনাকে ধরে ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে

গেলাম। ঢুকেই বাঁদিকে ড্রয়িং রুম। সেখানে সোফার উপরে বসিয়ে বাড়িতে আর কেউ আছে কিনা জানার জন্য কয়েকবার চেঁচিয়ে উঠলাম— এনিবডি হোম?

উত্তর পেলাম না। অন্য কোন ঘরেও আলো জ্বলছে না। তার মানে উনি এখানে একাই থাকেন। কিন্তু এই বয়সে বিশাল বাড়িতে একা থাকা সত্যিই কষ্টকর। ওনাকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে পাশে বসে থাকলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। অ্যাম্বুলেন্সে পুরো পথটাই উনি জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে ছিলেন।

হাসপাতালে পৌঁছে ওখানকার লোকদের কাছ থেকেই পরে শুনলাম যে উনি এখানে যথেষ্ট পরিচিত। শহরের খুব বড় একটা অকশন হাউসের, বেশ কয়েকটা বড় স্পা-এর আর একটা চেন রেস্টুরেন্টের মালিক উনি। ওনার এক ছেলে আর এক মেয়ে। দুজনেই বিদেশে থাকেন। তাঁদেরও ফোনে ওনার অসুস্থতার কথা জানানো হল।

আমি সারারাত ওখানেই ছিলাম। এই সময়ে ক্রিসমাসের ছুটির জন্য ডাক্তার-নার্স বেশ কম। আমি না থাকলে উনি বেশ সমস্যাতেই পড়তেন। মাঝে-মধ্যেই তাগাদা দিতে হচ্ছিল। তা না হলে উনি হয়তো স্ট্রেচারেই পড়ে থাকতেন । ভোররাতে নানান টেস্ট করার পর ওনাকে একটা বেডে দেওয়া হল। আমি আরও কয়েক ঘণ্টা ওখানে থেকে সকাল দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরলাম। দুপুরের দিকে হাসপাতালে ফোন করে জানলাম ওনার ছেলে এসে গেছে। ওনার সঙ্গেই আছে। আমার আর তাই যাওয়ার দরকার নেই।

পরের দিন আর যাওয়া হয়নি। হাসপাতালে ফোন করে একবার খোঁজ নিয়েছিলাম। ছেলে সঙ্গে আছে। উনি পুরোপুরি সুস্থ না হলেও অপেক্ষাকৃত ভালো।

এরপরে আমি আর কয়েকদিন খোঁজ নিইনি। অফিসের কাজে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, যে ওনার কথাটা মাথাতেই ছিল না। দু'সপ্তাহ বাদে এক অচেনা নাম্বার থেকে হঠাৎ ফোন পেলাম। বেশ কয়েকবার 'হ্যালো' বলার পরে উলটো দিকে এক ভদ্রমহিলার সাড়া পেলাম। দু' মিনিট বাদে পরিষ্কার হল সেদিনের সেই বৃদ্ধাই আমাকে ফোন করেছেন। উনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। আমাকে দেখতে চান। আমার নাম্বার হাসপাতালের কাছে ছিল। সেখান থেকেই পেয়েছেন। সেদিন

আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। কিন্তু আমাকে শুধু ফোনে মৌখিক ধন্যবাদ জানিয়েই উনি ক্ষান্ত নন। দেখা করতে চান।

বৃদ্ধার অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। পরদিন অফিস ফেরত ওখানে গেলাম। ওই পাড়াতে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধে সাতটা। বেশ ভালো ঠান্ডা। দশ দিন আগেও শীত তেমন ছিল না। আর আজ! খেলার শেষ মুহূর্তের গোলশোধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে জানুয়ারির শীত। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। তার মধ্যে সামান্য বৃষ্টি হয়েছে। গায়ে লংকোট আর মাথায় টুপি থাকলেও মুখে বরফের ছুরির মতো বৃষ্টির কণাগুলো এসে পড়ছে।

রাস্তার ষড়ভুজ ল্যাম্পশেডের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। তাদের হলদেটে আলোয় বৃষ্টির ফোঁটায় যেন রঙ লেগেছে। ২৯ ক্রাইস্টচার্চ রোড। থমথমে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। ড্রয়িংরুমের পর্দার ফাঁক থেকে শুধু সামান্য আলোর আভাস আসছে। বাগানের গেট খুলে নুড়ি ফেলা এক চিলতে পথ পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম। বাঁ দিকের বাগানে রকিং চেয়ারটা আজও দেখলাম। মনে হল দুলছে। কেউ যেন এক্ষুনি এখান থেকে উঠে গেছে। বাড়ির মেন দরজার দিকে এগোলাম। বিশাল কাঠের দরজা। সামনে যেতেই খুলে গেল। এক মাঝবয়সী মহিলা দরজা খুলে দিলেন। আমি ওনার পিছন পিছন এগিয়ে গেলাম। সামনেই দোতলায় ওঠার কাঠের চওড়া সিঁড়ি। সেদিকে না এগিয়ে আমাকে বাঁ পাশে বিশাল ড্রয়িংরুমের দিকে এগিয়ে যেতে বললেন। দরজা খোলা। বৃদ্ধা একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। উনি আমাকে দেখে মৃদু হেসে সম্ভাষণ করে সামনের লেদার সোফায় বসতে বললেন। ঘরের পরিবেশ বেশ সাবেকী। ফায়ারপ্লেসে কাঠের আগুন জ্বলছে। তার সামনে কিছু দূরে একটা নিচু ওভাল শেপের কাঠের টেবিল। তাতে একটা ভারী সুন্দর কাচের মোমদানিতে মোমবাতি জ্বলছে। তার আলোয় আলোর থেকে ছায়াই যেন বেশি। আর সে আলো-ছায়ায় ধরা দিয়েছে বিশাল ড্রয়িংরুম। ঘরের অন্যদিকে আরেকটা বিশাল ডিনার টেবিল। প্রায় কুড়িজন একসঙ্গে বসতে পারে তাতে। ঘরের দু'ধারে বিশাল কাচের জানলা। সেদিন এই ঘরেই এসেছিলাম। তবে অন্ধকার ছিল। আর ওনার দিকেই সমানে লক্ষ রাখতে হচ্ছিল বলে এতো খেয়াল করিনি। ঘরের দেওয়াল জুড়ে অনেক ছবি আর নানান কাঠের কাজ।

বৃদ্ধাকে আজ দেখলাম ভালো করে। আভিজাত্য পোশাকে, মুখমণ্ডলীতে। ঘরের আবছা আলোতেও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখটা। মাথাভর্তি সাদা কোঁকড়া চুল। মুখের মধ্যে ভারী সুন্দর একটা প্রশান্তির ছাপ।

মৃদু স্বরে বলে উঠলেন—তুমি আমার জন্য যা করেছ, তা নিজের ছেলেরাও করে না। তাই তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না। তা তুমি এখানে কি করো? কতদিন আছ?

আমার পরিচয় জানিয়ে বললাম—আরো কয়েকমাস থাকব। তা আপনি একাই থাকেন?

—হ্যাঁ, গত দশ বছর একাই থাকি। আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে। তবে বাড়িতে কাজের লোক আছে। বেশ কয়েকজন।

—তা সেদিন তো কেউ ছিল না! ছুটিতে ছিল?

—হ্যাঁ, সেদিন একাই ছিলাম। আর তাই—বলে একটু থেমে বললেন—দাঁড়াও তোমার জন্য চিকেন সুপ করেছি। খেয়ে নাও। বলে 'লিয়ন' বলে আস্তে করে ডেকে উঠলেন। দেখলাম দরজার কাছে একজন বছর ষাটের সুসজ্জিত বাটলার এসে দাঁড়াল। তারপর চোখের ইশারায় কর্ত্রীর নীরব নির্দেশ বুঝে আবার চলে গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে সামনের টেবিলে সুপ রেখে গেল। লিয়নকে লক্ষ করে বৃদ্ধা বলে উঠলেন—ও আমাদের এখানে বহু বছর আছে। আমার শ্বশুরের সময় থেকে। খুব ভালো রান্নার হাত।

বৃদ্ধা আস্তে আস্তে ওনাদের কথা বলতে লাগলেন। চার পুরুষের বাস এই শহরে। তবে এই বাড়ি কেনেন ওনার শ্বশুর স্টিভ। ফায়ারপ্লেসের উপরে রাখা সুট-টাই পরে সোফায় বসা অভিজাত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছবি দেখিয়ে বলে উঠলেন—ওনার আরও অনেক ব্যবসা থাকলেও আসল ব্যবসা ছিল পুরোনো জিনিস বিক্রির। আর তাতেই অনেক টাকা লাভ করেন উনি। ওই একই ব্যবসা আমার স্বামী জনও দেখতেন। কিন্তু খুব কম বয়সে জন মারা যান। তারপরে আমাকেই একা এই সব ব্যবসা পুরোপুরি সামলাতে হত। তারপরে আরও অন্যান্য কিছু ব্যবসা শুরু করি।

শুনলাম কিভাবে অন্য ব্যবসাতেও এর পরে উনি যথেষ্ট সাফল্য পান। খুবই উদ্যমী পরিশ্রমী মহিলা। এখন নেহাৎ বয়েস হয়েছে। কিন্তু তবু ব্যবসার খুঁটিনাটি

সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল। এমন কি ভারতেরও অনেক খোঁজ-খবর রাখেন। ব্যবসা সূত্রে কয়েকবার রাজস্থান গেছেন। ওনার এক ছেলে আর এক মেয়ে। এখন একজন আমেরিকা আর একজন অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। অসুস্থতার কথা শুনে ছেলে এসে দু'দিন থেকে আবার ফিরে গেছে আমেরিকায়।

ওনাদের অবস্থা আগে এতো ভালো ছিল না। এই বাড়ি-গাড়ি সবই ওই অ্যান্টিকের দোকান থেকে।

কথায় কথায় বললাম—হ্যাঁ, আপনার শ্বশুরমশাইকে দেখেই মনে হয় খুব পরিশ্রমী লোক ছিলেন। একই সঙ্গে খুব তুখোড় ব্যবসায়ী বলে মনে হয়।

—শুধু পরিশ্রম করলে কি হয়! ভাগ্যও লাগে। আর সেটাও ওনার ছিল। আর উনি, নাহ সে কথা থাক—থেমে গেলেন বৃদ্ধা। একটু থেমে আবার বলে উঠলেন—অনেক সময় আমরা সব কিছু পেয়েও শেষে হেরে যাই। উনি সারা জীবন প্রচুর রোজগার করেছেন, কিন্তু ওনার মতো অসুখী মানুষ খুব কম দেখেছি। আমার স্বামী জনও একইরকম ছিল। এতো অর্থ, তবুও কোনো কিছুতে যেন শান্তি নেই। ব্যবসা তো নয় সবসময় যেন একটা যুদ্ধ। সবসময় টেনশন। সেখানে ভালো-খারাপ বলে যেন কিছু নেই। তা জনও খুব অসুখী ছিল। কত কম বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। চলে যাওয়ার আগের দিনও এখানে সারারাত পার্টি হল। ও একটা বড় ব্রিজ তৈরির বরাত পাবে কিনা সে ব্যাপারে খুব চিন্তিত ছিল। ভোর রাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল, মনে হয় ওই কন্ট্রাক্ট পাবে। কেন পাবে সেটা বোঝাল। কয়েকদিন বাদে পেলামও। কিন্তু তখন ও আর নেই।

বৃদ্ধা থামলেন। ইতিমধ্যে বাটলার লিয়নের পিছু পিছু আরও দুজন ঘরে প্রবেশ করেছে ডিনার নিয়ে। বৃদ্ধা পরিচয় করে দিলেন। হেনরি আর মার্ক। বহু বছর ধরে আছে। চেহারায়-পোশাকে-ব্যবহারে সাবেকী কালের চিহ্ন। ডিনার টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে ওরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। রোস্ট চিকেন, তিন ধরনের সবজি। স্যালাড। ডেসার্ট।

কথায় কথায় ওনার ছেলের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। ছেলের নাম ম্যাট। পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিল। আমেরিকায় বড় ব্যবসা। কথায় কথায় উনি বলে উঠলেন—ও এসেছিল আমাকে দেখতে নয়। অন্য কাজে।

আমি একটু অবাক হয়ে বলে উঠলাম—কিসের কাজ?

—একটা ছবির খোঁজে। সে ছবিটা বাড়ির মধ্যে কোথায় আছে, সেটা আমিই শুধু জানি। আমি যদি মারা যাই, আমার সঙ্গে ওই ছবিটাও হারিয়ে যাবে। তাই এসেছিল এতো তাড়াহুড়ো করে। ছবিটা নিয়ে চলে গেল।

—কেন? ওর কি ছবির খুব শখ?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারো। তবে একটু অন্য ধরনের শখ। সেটা ও ওর বাবা-ঠাকুরদার থেকে পেয়েছে। আসলে ওর রক্তে তো শিল্প নেই, ব্যবসা আছে। আর আমাদের বাড়িতে কত ছবি আছে, দেখেছ তো? এগুলো সাধারণ লোকে দেখতে পেল না কোনোদিন।—বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সেদিন আরও দেড় ঘণ্টা ছিলাম। আসার সময় বৃদ্ধা বললেন—দাঁড়াও তোমার জন্য একটা ছোট উপহার আছে। —বলে আমার দিকে একটা আড়াই ফুট লম্বা টিউব দিয়ে বললেন—এর মধ্যে একটা ছবি আছে। তোমার জন্য। পরে বাড়ি গিয়ে খুলে দেখো।

আমি তখনই খোলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু দেখলাম ঢাকাটা বেশ শক্ত করে আটকানো।

সেটা দেখে উনি মৃদু হেসে বলে উঠলেন, পরে দেখো। যত্ন করে রেখো। এই আলোতে ছবি ভালো বুঝতে পারবে না।

সেদিন আরও খানিকক্ষণ থেকে চলে এসেছিলাম।

বাড়িতে এসে ওই টিউবটা থেকে ছবিটা বার করে দেখলাম। ছবির সঙ্গে একটা টাইপ করা চিঠি আছে, যেখানে উনি আমাকে এই ছবিটা উপহার দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। বেশ পুরোনো ছবি। দু ফুট বাই দেড় ফুট। অয়েল অন ক্যানভাস। একটা মাঝবয়েসী লোকের ডান হাতে ধরা ফলের ঝুড়ি। ঝুড়ির মধ্যে আপেল, লেবু, চেরি, আঙুর, বেরি, পিয়ার এরকম নানান ফলের সঙ্গে কিছু পাতা সাজানো আছে। লোকটা অন্য হাতের তর্জনী তুলে উপরের দিকে কিছু একটা নির্দেশ করছে। আর সেদিকে তাকিয়ে আছে। যেদিকে নির্দেশ করছে ঠিক সে দিক দিয়েই আলো এসে লোকটার মুখে পড়েছে। লোকটার মুখভর্তি দাড়ি। ঘাড় অব্দি কোঁকড়ানো চুল। চোখের নীচটা সামান্য বসা। মুখের মধ্যে একটা

বিষণ্ণতা। সব মিলিয়ে বেশ ভালো ছবি। পরের দিন দোকান থেকে একটা ফ্রেম কিনে ছবিটা ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলাম।

এরপরে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। রঞ্জন আমার স্কুলের বন্ধু। ও বেশ কয়েক বছর ধরে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে থাকে। এক উইক এন্ডে হঠাৎ এসে হাজির। ও ছবির বেশ ভালো সমঝদার। নানান আর্ট একজিবিশনে যায়। নিজেও খুব ভালো ছবি আঁকে। আমার ওই ছবিটা ড্রয়িংরুমে রাখা ছিল। ওটা দেখে কেন জানি না—ও বারবার করে ঘুরে ফিরে বেশ খানিকক্ষণ ধরে লক্ষ করতে থাকল। তারপরে বলে উঠল—তুই এ ছবিটা কোথায় পেয়েছিস?

—কেন? কি ব্যাপার?

—আহা, আগে বলই না। এ ছবিটা কোথায় পেলি?

আমি পুরো ঘটনাটা বললাম। ও খুব গম্ভীর হয়ে শুনল। তারপরে হঠাৎ করে ওর ফোনে কিসব সার্চ করতে শুরু করল। মুখ-চোখ দেখে মনে হল বেশ উত্তেজিত।

বেশ কয়েকবার প্রশ্ন করলাম, কোনো উত্তর পেলাম না। শুধু একবার উত্তেজিতভাবে বলে উঠল—এ ছবিটার কোথাও কোনো উল্লেখ পাচ্ছি না। আর্টলস রেজিস্টারেও না। কিন্তু আমার মন বলছে এটা ক্যারাভাজ্জিওর আঁকা। সেই এক স্টাইল। কিন্তু তারপরেই মনে হচ্ছে তা কি করে সত্যি হয়?

—কি বল না, খুলে। আর্টলস রেজিস্টারটা কি?

—যে কোনো নামকরা ছবি চুরি হয়ে গেলে, ওই রেজিস্টারে থাকে। আর তাই চুরি করা ছবি বিক্রি করা সহজ হয় না।

—চুরি? কিসের চুরি?

—বলছি, তার আগে আমার ওই মহিলার সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য লাগবে। আমি এটুকু জানি এরকম একটা ছবি ক্যারাভাজ্জিও তার শেষ জীবনে এঁকেছিল। কিন্তু গত চারশো বছরে তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। নেহাৎই আমার এ বিষয়ে বেশ কিছু পড়াশোনা আছে, কিছুটা রিসার্চও আছে, তাই জানি।

বৃদ্ধা সম্বন্ধে আমার যা জানা ছিল সব বললাম।

ও চুপ করে শুনল তারপরে বলে উঠল—আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয় তাহলে তুই কি পেয়েছিস ভাবতে পারছিস না। ক্যারাভাজ্জিও-র নাম শুনেছিস?

—না। খুব নামকরা কোনো আর্টিস্ট?

—তুই ক্যারাভাজ্জিওর নাম শুনিসনি? ব্যারোক স্টাইলের পেন্টিং-এর অন্যতম পুরোধা। পনেরোশো সালের মাঝামাঝি খ্রিস্টধর্মের বার্তা সাধারণের কাছে আরও ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই ধরনের পেন্টিং ক্যাথোলিক চার্চের উৎসাহে আঁকা শুরু হয়। বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনাকে চাক্ষুষ তুলে ধরার জন্য এ ছবি আঁকা হত। ক্যারাভাজ্জিও ইতালির সবথেকে নামকরা চিত্রশিল্পীদের মধ্যে একজন। এতো বছর বাদেও ওনার আঁকা সব চিত্রশিল্পীদের প্রভাবিত করে। অবশ্য মানুষ হিসেবে উনি খুব ভালো ছিলেন না। একদিকে শিল্পী হলেও, অন্যদিকে ছিলেন একদম গুন্ডা। সারা জীবনই খুন-খারাপি করে কাটিয়েছেন। খুব রগচটা ছিলেন। যখন-তখন ছোরা বার করে আক্রমণ চালাতেন। তাও আবার পিছন থেকে কাপুরুষের মতো। একবার এক পুলিশকে ছোরা মেরে জখম করেন। পরে অন্য এক ঘটনায় রোমের রাস্তায় ছোরা চালিয়ে একজনকে মেরেও ফেলেন। ওনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। উনি তখন রোম থেকে পালিয়ে মালতা চলে যান। বাকি জীবনটা পালিয়ে পালিয়ে কেটেছিল। শুনেছি শেষদিকে ওনার মাথারও ঠিক ছিল না। ১৬১০ সালে ৩৯ বছর বয়সে মারা যান। কিভাবে মারা যান তা আজও কেউ সঠিক জানে না। এ ছবিটা খুব সম্ভবত শেষদিকেরই আঁকা। শোনা যায় বেশ কয়েকজন প্রাইভেট কালেকটারের হাত বদল হয়েছিল এ ছবিটা। কিন্তু কখনই জনসমক্ষে আসেনি। এটাই যদি সেই ছবি হয়, তার দাম কি হবে ভাবতে পারছিস?

—কত?

—জানা নেই। হয়তো একশো মিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি। ভাবতে পারছিস, যে ছবি এতো বছর ধরে সব চোখের আড়ালে আছে, যার খোঁজ সারা বিশ্বময় চলছে, তার দাম কি হতে পারে? তবে একে তো আর শুধু টাকার বিচারে ভাবা যায় না। যদি এটাই সেই আসল ছবি হয় তাহলে এককথায় এ ছবি অমূল্য। অবশ্য এটা আসল ছবি না হওয়ার সম্ভাবনাই নিরানব্বই শতাংশ। তা হলে তো এই ছবি কবেই বিখ্যাত কোনো মিউজিয়ামে স্থান পেত।

—আমারও মনে হয় এটা একটা সাধারণ ছবি। না হলে এই সামান্য পরিচয়ে আমার হাতে কেউ এ ছবি তুলে দেয়? তা তোর কেন মনে হল এটা ক্যারাভাজ্জিওর?

—কারণটা বলি। ছবিটা দেখেই মনে হয় খুব পুরোনো। তাই তো? এবার ক্যারাভাজ্জিওর কথায় আসি। ওনার পেন্টিং স্টাইলের সঙ্গে এ আঁকা হুবহু মিলে যায়। সেই একইরকম আলো-ছায়ার কাজ। যেন ত্রিমাত্রিক কোনো ছবিতে নাটকের একটা মুহূর্ত ধরা হয়েছে। ওঁর ১৫৯৩ সালে আঁকা সেই বিখ্যাত ছবি 'ফলের ঝুড়ি'র সঙ্গে এ ছবির ফলের ঝুড়ি একদম মিলে যায়। একইরকমের ফল, একইরকমের পাতা। ছবির পিছনে তেমন কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, যেটা ওনার ছবিতেও থাকত না। আর তাছাড়া খুব শক্তিশালী কারুর হাতে আঁকা সেটা তো দেখেই বুঝতে পারছিস। দেখেস মনে হয় যেন দর্শকও ওই ছবির একটা অংশ। তবে আমি অন্য কয়েকজন চিত্রশিল্পের সমঝদারকে দেখাতে চাই। তবে তার আগে তুই একবার বৃদ্ধাকে গিয়ে হালকাভাবে জিজ্ঞেস কর যে এ ছবিটা কোথা থেকে পেয়েছেন। কিন্তু ভুল করে আবার বলে দিস না, যে এ ছবি নিয়ে তুই কি সন্দেহ করছিস। এ ছবির মূল্য হয়তো বৃদ্ধা জানেন না, ভুল করে তোকে দিয়ে দিয়েছেন সেটাও হতে পারে। আর সবকিছু জানার পরে মন বদলাতেই পারেন। আর নকল হলেও এটুকু বলতে পারি, এ ছবি বেশ ভালো কারুর হাতেই আঁকা। আর সে শিল্পী নির্ঘাত ক্যারাভাজ্জিওরই শিষ্য।

—না, রঞ্জন। এ ছবি আমি নেব না। যদি জানতে পারি এটা দামি কোনো ছবি, তাহলে আমি ওনাকে ফেরত দিয়ে দিতে চাই। কোনোভাবেই নেব না।

—আহা, সে কথার এখনই দরকার কি? আগে তো গিয়ে দেখ, কি বলেন!

আমাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করল রঞ্জন। কিন্তু আমি মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছিলাম যে এ ছবি ক্যারাভাজ্জিও-র আঁকা হলে বা দুর্মূল্য কোনো ছবি হলে আমি কোনোভাবে নেব না। ও কথা দিল যে এ ছবির কথা কেউ জানবে না। তবে এরকম কোনো ছবি ছিল কিনা সেটা জানার জন্যও খোঁজখবর নেবে। এ ব্যাপারে যাঁরা এক্সপার্ট আছেন তাঁদের পরে একদিন নিয়ে আসবে। আমি সেটাতে এখনই সম্মতি দিলাম না। জানালাম যে তার আগে আমি বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে নিতে চাই।

পরের দিন আমি আবার ওই বাড়িতে গেলাম। অফিস ফেরত। যথারীতি ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে ছবি অবশ্য নিয়ে আসিনি। যদি সত্যি এ ছবি সে ছবি হয়, সেটা নিয়ে তো আর রাস্তায় ঘোরা চলে না। তবে আমার বিশ্বাস এটা খুব

সাধারণ কোনো শিল্পীর আঁকা ছবি। হতে পারে পুরোনো। হতে পারে এর কোনো ইতিহাস আছে। আর সেটা জানতেই আসা।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে অবাক হলাম। বাঁদিকে ঘাসের লনে সেই রকিং চেয়ার দুলছে। অথচ কেউ নেই। ভেতরে সেদিনকার মতো মৃদু আলো জ্বলছে শুধু ড্রয়িংরুমে। মেন দরজার সামনে যেতেই দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে দিয়েছে সেদিনকার সেই মধ্যবয়সী মহিলা। মহিলা মৃদু হেসে সম্ভাষণ করে বাঁ দিকে ড্রয়িংরুমের দিকে নির্দেশ করল। দেখি বৃদ্ধা ঠিক সেদিনকার মতোই বসে আছেন। ফায়ারপ্লেসের দিকে মুখ করে। আমার পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকালেন। তারপর মৃদু হেসে বলে উঠলেন—কি, ভালো আছ তো?

—হ্যাঁ, আমি আপনাকে না জানিয়ে এসে বিরক্ত করলাম। আসলে আপনি আমাকে যে ছবিটা দিয়েছিলেন তার সম্বন্ধে—

—ছবিটা ক্যারাভাজ্জিও-র আঁকা কিনা তাই জানতে চাও তো?—বৃদ্ধা আমাকে থামিয়ে বলে উঠলেন।

থমকে গেলাম। একটু থেমে কোনোরকমে বলে উঠলাম—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, ওটা ক্যারাভাজ্জিও-রই আঁকা। অন্তত তাই তো শুনেছি। আর এও শুনেছি এ ছবি অমূল্য। কয়েকটা কারণে। এক, এটাতে ক্যারাভাজ্জিও নিজেই আছেন। উনি নিজেকেই এঁকেছেন। দুই, ওনার আঁকার রহস্য খানিকটা হলেও এ ছবিতে তুলে ধরেছেন।

—কিরকম?

—উনি ওনার সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। এটা বোঝা যেত না, অত নির্ভুল ভাবে ওনার ছবিতে আলো আর ছায়ার দাগ তুলে ধরতেন কিভাবে। এতো নিখুঁতভাবে ছবির সাবজেক্টকে কিভাবে আঁকতেন। এটা একটা বিশাল রহস্য। বেশিরভাগ শিল্পী তাঁদের আঁকার কথা লিখে যান। উনি কিন্তু কিছুই লিখে রেখে যাননি। এ ছবি খুঁটিয়ে দেখলে দেখবে লোকটা যেদিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করছে, সেখানে একটা ছোট আয়না আছে। বাইরে থেকে আসা সূর্যের আলো ওই আয়নার উপরে পড়ে প্রতিফলিত হয়ে লোকটার উপরে এসে পড়েছে। আয়না ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে সূর্যের আলোর প্রতিফলন ছবির সাবজেক্টের

উপরে নানানভাবে ফেলা সম্ভব হত। আর তাই আলো-ছায়ার শেডগুলো, মুখের এই অভিব্যক্তি এতো নিখুঁতভাবে তুলে ধরা সম্ভব হত। এ ছবিতে ওনার আঁকার মেথড প্রমাণিত হয়। আর তাছাড়া এটাই বোধহয় ওনার আঁকা শেষ ছবি। আর তাই ওনার চোখে এই বিষণ্নতা। দৃষ্টি অন্ধকারের দিকে নয়, আলোর দিকে। হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন যে সারা জীবন অন্ধকার জগতে থাকলেও শেষ দিকে উনি আলোর জগতে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন ভালো কাজের মধ্যে ফিরে আসার। আর তারই প্রতিফলন এই ছবি। আমাদের সবারই হয়তো কোনো না কোনো সময় তাই ইচ্ছে হয়। মনে হয় কিভাবে আলোর জগতে ফেরা যায়। তাই না?

—আমি কিন্তু এই ছবি আপনাকে ফেরত দিয়ে দিতে চাই। আমার এতো দামি উপহারের কোনো প্রয়োজন নেই।

—কেন? তুমি ভয় পাচ্ছ যে এটা চুরি করা ছবি? তোমাকে পুলিশ ধরবে, তাই? তোমাকে তাহলে এর ইতিহাস বলি। বলেছি না, আমার শ্বশুরমশাইয়ের হঠাৎ করে ভাগ্য ফেরে। এটা আমার শ্বশুরমশাই কেনেন এক পুরোনো দোকান থেকে। যে বিক্রি করেছিল, সে ছবির কিছুই বুঝত না। জানতও না যে এ ছবির এতো দাম হতে পারে। মাত্র ২০ ডাচ গিল্ডারে আমার শ্বশুরমশাই এটা কেনেন তার কাছ থেকে। তখন উনি নেদারল্যান্ডে থাকতেন। উনি কিন্তু এটার দাম ঠিকই বুঝেছিলেন। এককথায় বলতে পারো জেনেশুনে ঠকিয়ে ছিলেন। উনি ভালো জিনিসের খুব বড় সমঝদার ছিলেন। আর ছবির ব্যাপারেও ওনার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। এভাবে আরও বেশ কিছু জিনিস উনি কেনেন, যার আসল দাম ছিল অনেক বেশি। আস্তে আস্তে আমার শ্বশুরের সমৃদ্ধি হয়। এ ছবিটা আর উনি বিক্রি করেননি। ওনার কাছেই রেখে দেন। তার অবশ্য একটা কারণও ছিল। উনি জানতেন এ ছবি বিক্রি করা অতো সহজ হবে না। কারণ ততদিনে সারা বিশ্বের কাছে এ ছবির খবর পৌঁছে গেছে। বিক্রি করতে গেলেই ধরা পড়ে যাবেন।

নেদারল্যান্ডের নিয়ম অনুযায়ী তিরিশ বছর কোনো ছবি কারুর কাছে থাকলে সেই এ ছবির মালিক হয়ে যায়। উনি তার অপেক্ষায় থাকলেন। তখন আইনত বিক্রি করতে কোনো অসুবিধে হবে না। তিরিশ বছর কাটল। উনিও ছবির আইনত মালিক হলেন। কিন্তু তার দু'দিন বাদেই মারা গেলেন। আমরা ততদিনে অবশ্য

ইংল্যান্ডে চলে এসেছি। এরপরে ছবির মালিক হলেন আমার স্বামী। কিন্তু উনিও এ ছবি বিক্রি করলেন না। এটা আমাদের বাড়িতেই রয়ে গেল। তা তুমি এখন ছবি বিক্রি করতে পারো, কারণ আমার চিঠি অনুযায়ী তুমিই এখন এ ছবির মালিক।

—না, আমার টাকার কোনো দরকার নেই। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার জন্য যা করেছি, তা তো আমি কোন পুরস্কারের লোভে করিনি। আপনাকে অনুরোধ করব এ ছবি ফেরত নিয়ে নিন।

—তুমি এ ছবির দাম জানো তো? এ ছবি তোমাকে অবশ্য কোনো প্রাইভেট আর্ট কালেকটারকে বিক্রি করতে হবে। কিন্তু এর দাম কত হতে পারে, তা হয়তো তুমি ভাবতেও পারছ না।

আমি মৃদু হেসে বলে উঠলাম,—জানি বলেই তো আর নিচ্ছি না। আমার সত্যিই টাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি এ ছবি ফেরত নিন। আপনি এটা কোনো আর্ট মিউজিয়ামে দান করে দিন, যাতে সবাই এ ছবি দেখতে পায়।

বৃদ্ধার মুখে এতক্ষণে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। বলে উঠলেন, তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম। ঠিক হাতেই ছবিটা গেছে তাহলে। তুমি ওটা কোনো ভালো কাজে লাগিও। তোমাকে আমি আরও কিছু কথা জানাই। আমার স্বামী জনও খুব ভালো লোক ছিল না। ও এ ছবি একবার বিক্রিও করে। কিন্তু আসলটা নয়। এর হুবহু নকল। এ ছবি পঁচিশ মিলিয়ন পাউন্ডে বিক্রি করে এক বড় প্রাইভেট আর্ট কালেক্টরকে। আসল ছবি বিক্রি না করে অবিকল একইরকম একটা ছবি অন্য শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়ে বিক্রি করে। যিনি কেনেন, তিনি পরে বুঝতে পারেন যে ওনাকে ঠকানো হয়েছে। কিন্তু এমনিতেও এ ছবির কেনাবেচা খুব গোপনীয় ভাবে হয়েছিল, আইনত কেনা হয়নি, তাই ওনার পক্ষে কিছু করার উপায় ছিল না। শুনেছিলাম ওই লোকটা পরে ব্যাঙ্কের দেনা না মেটাতে পেরে আত্মহত্যা করেছিল। আসল ছবিটা আমাদের কাছেই থেকে যায়।

বৃদ্ধা একটু থামলেন—দু-দুবার আমাদের পরিবার এ ছবিটা নিয়ে অন্যদের ঠকিয়েছে। আমি চাই না এ ছবি আমার কাছে রাখতে। সেদিন আমার ছেলে ম্যাটও এই ছবির খোঁজেই এসেছিল। কিন্তু আমি ওকে ওর অন্য একটা নকল ছবি দিয়ে দিয়েছি। নিজের ছেলে তো! চাইনি ওর মধ্যেও ওর বাবা-ঠাকুরদার মতো

খারাপ ভাবে অর্থ রোজগারের ইচ্ছা জেগে উঠুক। আমরা খুব বড়লোক হলেও, কখনও সুখের খোঁজ পাইনি। হয়তো আমরাও এ ছবি পাওয়ার পরে ওই ক্যারাভাজ্জিওর মতোই হয়ে উঠেছিলাম। আর ঠিক যেভাবে উনি শেষজীবনে অন্ধকার থেকে আলোতে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন, আমিও তারই চেষ্টা করছি এখন। নাও, এ ছবি তোমার কাছেই রেখে দাও। তোমার কাজে না লাগুক, তুমি এটা কোনো ভালো কাজে লাগিও।

আমি চুপ করে রইলাম। উনি আবার বলে উঠলেন—আর আমি চাইলেও তো আর ফেরত নিতে পারব না।

—কেন? পারবেন না কেন? আইনত কোনো বাধা আছে?

কথাটা বলেই থেমে গেলাম। চোখের সামনেই বৃদ্ধা যেন হাওয়াতে মিলিয়ে গেলেন। ফায়ারপ্লেসের আগুনটা জ্বলছে। মোমবাতিটা জ্বলছে। কিন্তু হঠাৎ করে উনি উধাও। ঘরে কেউ নেই। কাঠের চেয়ারটা ফাঁকা। কেউ বসে নেই।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। অন্য যে মহিলা আমার পিছনে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে এ ঘরে নিয়ে এসেছিল, সেও নেই। আমি কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালাম। ফায়ার প্লেসের উপরে ওনার শ্বশুরের ছবিটা চোখে পড়ল। সেদিনও দেখেছি। কিন্তু আগে লক্ষ করিনি। উনি সোফায় বসে আছেন। সোফার পিছনে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই মহিলা, যে আমাকে দরজা খুলে দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল। সোফার অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাটলার লিয়ন, যে আমাকে সেদিন সুপ খাইয়েছিল। সেই একইরকম চেহারা। একইরকম বয়েস। ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু বাইরে এসে অবাক হয়েছিলাম। সেই রকিং চেয়ার। সেটা তখনও একইভাবে দুলে যাচ্ছে। আর তাতেও কেউ নেই। কোনোরকমে একছুটে নুড়ি ফেলা পথ পেরিয়ে গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম।

পরে বাড়ি এসে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে আমি যেদিন ওনাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম, তার দু'দিন বাদেই উনি মারা যান। অর্থাৎ আমি প্রথমবার ওনার বাড়ি যাই ওনার মৃত্যুর পরে।

তোমরা ভাবছ, ছবিটার কি হয়েছে, তাই তো? আমি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার আগেই ওখানকার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় ওটা দান করি। ওরা বিভিন্ন

দেশের গরিব বাচ্চাদের সাহায্য করে। শুনেছিলাম ওরা ওই ছবিটা অনেক টাকায় এক আর্ট কালেকটরকে বিক্রি করেছে। আর সে টাকা দিয়ে বেশ কিছু বাচ্চার জীবন সংস্থান হয়েছে।

আমার মনে হয় আমরা সবাই এক আলো-ছায়ার জগতে থাকি। কখনও সেখানে আলো, কখনও সেখানে ছায়া। সুখের খোঁজে ছোটাছুটি করতে গিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিফলন দেখতেও ভুলে যাই। বুঝিও না যে ছায়ার মধ্যে হারিয়ে গেছি। আমারও হয়তো তাই হত। ওই ছবিটাই আমাকে সেদিন আলোর সন্ধান দিয়েছিল।

আজ আমি তাই ভালো আছি। শুধু ওই রকিং চেয়ার ফোবিয়াটা বাদ দিলে।

বাটারফ্লাই এফেক্ট

এক কাপ চা আর মুড়ি—বিকেলে এই একই খাবার রীমাদেবী গত তিরিশ বছর ধরে খেয়ে আসছেন। আজকে ওনার সেটা খাওয়ারও আর ইচ্ছে হল না। শরীর এতোটাই খারাপ। গত কুড়ি বছর ক্যান্সারে ভুগছিলেন। এখন একদম শেষ পর্যায়। বড়জোর আর দু-এক দিন। তারপরে সব শেষ।

অবশ্য বয়স তো আর কম হল না। আসছে আষাঢ়ে একশো তিরিশ বছর পূর্ণ করবেন উনি। তবু মনে হয় যদি আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকা যেত। জীবনের সব সাধ এখনও পূর্ণ হয়নি। জীবন যে এতো সুন্দর, প্রতি মুহূর্তে তাকে যে এভাবে আবিষ্কার করতে হয়, সেটা উনি আগে টের পেতেন না। সেই উপলব্ধিটা পুরোটাই ভুলোর থেকে পাওয়া।

এখনও মনে পড়ে সেই দিনটা। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

তার আগে বেশ কয়েকদিন ধরে নিজের একাকিত্ব টের পাচ্ছিলেন রীমাদেবী। একমাত্র ছেলে রজত বহু বছর আমেরিকাতে ছিল। যোগাযোগ এমনিতেই কমে এসেছিল। কিন্তু তবুও তার অস্তিত্ব তো ছিল। মাঝে-মধ্যে ফোনে উলটো দিক থেকে গলা শোনা যেত।

কিন্তু সেদিন ফোনে হঠাৎ করে খবরটা পাওয়ার পর ওনার মনে হল আর বেঁচে থাকা অর্থহীন। বৌমার ফোন এসেছিল। রজত আর নেই। তার আগে কয়েকদিন নাকি বেশ অসুস্থ ছিল। ভাইরাল ফিভার। অজানা কোনো ভাইরাস। কিন্তু তাতে যে রজত মারা যাবে, তা ডাক্তারও ভাবতে পারেনি।

খবরটা পাওয়ার পর রীমাদেবী চুপ করে বসেছিলেন বেশ খানিকক্ষণ। এতোটাই শক পেয়েছিলেন যে চোখে জলও আসেনি। স্বামী মারা গেছেন প্রায় কুড়ি বছর আগে। রজত চলে যাওয়ার পরে আর কেউই থাকল না তেমন

আপনার বলার মতো। কি করেছেন এই জীবনে? কি পেয়েছেন? কিছু কি রেখে যেতে পেরেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য? কিছুই না। মনে হল বালির উপরে হারিয়ে যাওয়া জলের দাগের মতো ওনার পুরো জীবনটাই যেন অর্থহীন কাজে হারিয়ে গেছে।

তার মধ্যে বাইরে ঝড় শুরু হয়েছিল। বারান্দায় এসে বসেছিলেন উনি।

সামনের জামগাছটার থেকে সমানে পাতা উড়ে আসছিল বারান্দায়। যেন বারবার বলে যাচ্ছিল সময় ফুরিয়ে গেছে ওই পাতাগুলোর মতোই। ওনার পায়ের কাছে উড়ে এসেছিল আরেকটা পরিচয়হীন ছোট গাছের ডাল। তাতে যেন ঠিক ওনারই ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন।

ঠিক সেই সময় বাইরে কলিং বেল বেজে উঠেছিল। এ ফ্ল্যাটে এসময় লোক আসে না। তাই অবাক হয়েছিলেন। তবু ক্লান্ত পায়ে বাইরের শেষ অতিথিকে দেখার জন্য দরজা খুলতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। দরজা খুলে বাইরে তাকিয়ে আরও অবাক হয়েছিলেন। কেতাদুরস্ত পোশাকে স্যুট-টাই পরা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন—আমি 'অসময়ের সঙ্গী' থেকে আসছি। আমাদের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?

রীমাদেবী অবাক হয়ে বলে উঠেছিলেন—না।

—কয়েক মাস হয়েছে। কিন্তু এরমধ্যেই আমাদের কাজ রীতিমতো চারদিকে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। এই দেখুন খবরের কাগজে আমাদের কথা।—বলে একটা প্রচলিত কাগজের পাতা এগিয়ে দিয়েছিলেন রীমাদেবীর হাতে। রীমাদেবী এক ঝলক হেডলাইনটা দেখে পড়ার আর বেশি আগ্রহ দেখাননি।

লোকটা ফের বলে উঠেছিল—আমাদের সংস্থা খেয়াল রাখে কোনো মানুষ মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে কি না। বুঝতেই পারছেন আজকাল চারদিকে ছোট ছোট পরিবার। সামান্য কারণে লোকেদের মধ্যে সুইসাইডের ইচ্ছে তাই বহুগুণ বেড়ে গেছে। আর তাই আমরা যখন দেখি কারুর মধ্যে সেরকম সম্ভাবনা আছে, আমরা তাকে মানসিকভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে যাই। এই যেমন, আজকে আপনার ছেলের মৃত্যুর খবর, দোকান থেকে আপনার কিছু বেশি মাত্রার ঘুমের ওষুধ সংগ্রহ, আপনার কাজের লোকটাকে মাসকাবারির

আগেই সব টাকা মিটিয়ে দেওয়া, বাড়ির কিছু দামি জিনিস আপনার ড্রাইভারকে দিয়ে দেওয়া—এরকম নানান ধরনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমাদের কম্পিউটার মডেল বলে দিয়েছে আপনি ঠিক কি করতে চলেছেন।

লোকটা একটু থেমে থেকে বলে উঠল—আর তাই আমাদের এখানে আসা।

লোকটার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন রীমাদেবী। মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। শুধু বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে করতে পারলেন না। ভারী মিষ্টি মুখ। কিরকম জুলজুল চাউনি। গভীর দুটো চোখের বড় বড় পাতায় অনেক যেন প্রশ্ন। মুখে হালকা হাসির ছোঁয়া।

বাচ্চাটা পাশ থেকে বলে উঠল—আমার নাম ভুলো। আমি তো তোমার সঙ্গে থাকতে এসেছি। আমি তাহলে কোথায় থাকব?

এমনভাবে বলে উঠল যে কিছু একটা বলতে গিয়ে রীমাদেবীর গলা থেকে কথা আর বেরোল না। কান্নায় গলা যেন অবরুদ্ধ হয়ে গেল। মনে পড়ল রজতের কথা। রজতের ছোটবেলার কথা। ও ঠিক একইরকম সরলভাবে প্রশ্ন করত।

লোকটা ফের সেলসম্যানের ভঙ্গিতে টাইটা ঠিক করতে করতে বলে উঠেছিল—মানুষের সবথেকে বড় অভাব কি জানেন? বন্ধু। কথা বলার লোক। আর সবথেকে বড় বন্ধু হল ছোট বাচ্চা। আর তাই ভুলোকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কিছুদিন সঙ্গে থাকলেই বুঝতে পারবেন আপনি কত বড় ভুল করতে যাচ্ছিলেন। জীবন কতোটা সুন্দর। আর চলার পথে প্রত্যেক মুহূর্তকে মিস না করে নিজেকে নতুনভাবে খুঁজে পাওয়ার নামই জীবন।

কথাটা সেদিন ঠিকই বলেছিল লোকটা। তারপরে আরও পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে।

আর আজ তাই জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেটাই যেন বারবার মনে হয়েছে রীমাদেবীর।

এতো আনন্দে আগে কোনোদিন ছিলেন বলে মনে হয় না। আর এই নতুন করে জীবনকে খুঁজে পাওয়ার সংক্ষিপ্ত নাম হল ‘ভুলো’।

ভুলো মানে সত্যিই ভুলো। মাঝে-মধ্যেই ভুল করবে। আর তারপরে চোখ গোল গোল করে অবাক চোখে বলে উঠবে—যাহ, সব ভুল হয়ে গেল।

আর সেটা এতো সুন্দর ভাবে বলবে যে, মনে হবে সেটা শোনার জন্যই আরও দশ বছর বাঁচতে পারলে ভালো হত।

ওর বয়স আর বাড়েনি। একইরকম আছে। কথাটা ভেবেই হাসি পেল। বাড়বে কি করে? রোবটদের আবার বয়স বাড়ে নাকি? কিন্তু ভুলোকে যেন রোবট বলে মানতে ইচ্ছে হয় না ওনার। ও যেন সব মানুষের থেকেও অনেক বেশি মানুষ। এমন কি রজতকেও হয়তো কখনও এতো ভালোবাসেননি উনি।

এতো বকবক করতে পারে ভুলো, যে মাঝে-মধ্যে ধমক দিয়ে থামাতে হয়। কিন্তু তাও বা কতক্ষণ, ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে আবার যে কে সেই। আসলে রাগ-অভিমানের ব্যাপারটাই নেই ওর মধ্যে। আর সেরকম অস্বাভাবিক কৌতূহল।

—মা বেড়ালটা কার্নিশে বসে আছে কেন?

যার কথা এতক্ষণ বসে ভাবছিলেন, হঠাৎ করে পাশ থেকে তার প্রশ্নে চমকে উঠলেন রীমাদেবী।

—তা কোথায় বসবে? সোফায়?

—না। মাটিতে। আমি যখন কালকে রেলিং-এর উপরে বসতে গিয়েছিলাম, তুমিই তো বলেছিলে যে আমি নাকি উপর থেকে পড়ে যাব।

—ওরা পড়ে না। আর উপর থেকে লাফ দিলেও ওদের লাগে না।

—আমিও লাফ দিয়ে দেখব?

—না, না—চমকে উঠলেন রীমাদেবী।—তুই আবার লাফ দিবি কেন? কলকব্জা সব নড়ে যাবে।

—আমার লাগবে না। আমি জানি। দুবার তোমাকে না জানিয়ে বাইরের সিঁড়ির উপর থেকে নীচের সিঁড়ি অব্দি লাফ দিয়ে দেখেছি। ওই যে পাশের ফ্ল্যাটের রুকু আছে না, সেও আমার দেখাদেখি লাফ দিতে গিয়ে পা ভেঙেছিল। আমার কিচ্ছু হয়নি।

—সর্বনাশ! আরে ইচ্ছে করে কেউ লাফ দেয়! একদমই লাফ দিবি না আর।

—তবে বেড়াল কোন লাফ দেয়?

—আহা, বেড়াল হল বেড়াল, ওরকম লাফালাফি করা ওদের স্বভাব।

—স্বভাব কি মা? আমার মনে হয় লাফানোটা আমারও স্বভাব।

অন্যদিন হলে কথা চালিয়ে যেতেন রীমাদেবী। আজকে বলে উঠলেন—আচ্ছা, আমি না থাকলে তুই কি করবি বল তো? তোর তো এখনও কোনো বুদ্ধি হয় না।

—কেন মা, তুমি কেন থাকবে না?

—মানুষ মাত্রেই তো একদিন না একদিন মারা যাবে। আমিও মারা যাব। দেখলি না আজকে ডাক্তার এলো। বলে গেল আমি আর থাকব না। আমাকেও চলে যেতে হবে—বলতে বলতে আবার আবেগে কথা আটকে গেল রীমাদেবীর। কাছে টেনে নিলেন ভুলোকে।

—তুমি চলে যাবে মা? আমিও তাহলে একসঙ্গে চলে যাবো।

—ছিঃ ছিঃ, ওরকম কথা বলতে নেই। তাতে অমঙ্গল হয়। তুই থাকবি। চিরকাল থাকবি। কথাটা বলতে বলতে ফের অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন রীমাদেবী।

উনি জানেন কি হবে। একসময়ে 'অসময়ের সঙ্গী' থেকে বহুবার ভুলো-কে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। অনেক কষ্টে আইনের সাহায্য নিয়ে উনি সেটা বন্ধ করেছিলেন। ভুলোকে তৈরি করার সময় ওরা নাকি ইচ্ছে করে ওকে এমনভাবে তৈরি করেছিল যাতে ও মাঝে-মধ্যে ভুল করে। এতে নাকি মানুষের সঙ্গে ও সহজে মিশতে পারবে। সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে। যাতে ও সহজে ভুলে যায়, সবসময় ঠিক ভাবে কাজ না করে, মানুষের সঙ্গে থেকে ভুল করতে শেখে, নিয়ম যাতে ভাঙে—সেভাবেই নাকি ওকে তৈরি করা। কিন্তু একটা জিনিস ওরা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি যে কিভাবে সেরকম প্রোগ্রাম বারবার লেখা যায়। শুধু একবারই ওরা ভুলোর মতো একজনকে তৈরি করতে পেরেছে।

এর পিছনে কি ক্যাওস থিওরি? কোন ধরনের রাউন্ডিং এররের জন্য বাটারফ্লাই এফেক্ট, যার জন্য দ্বিতীয়বার ভুলোর মতো কাউকে তৈরি করা যায়নি। এডওয়ার্ড লরেঞ্জের বলা সেই বাটারফ্লাই এফেক্ট যাতে একটা প্রজাপতির পাখা ঝাপটানোর জন্য বিশেষ কিছু অবস্থার উপরে নির্ভর করে বহু দূরে বহু সপ্তাহ বাদে প্রবল ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। সেরকমই কি কিছু ঘটেছিল ভুলোর সঙ্গে?

না, ভুলোর ভুলের পিছনে কি কারণ তা ওরা এখনও নিশ্চিতভাবে জানে না। তাই ভুল করার জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করার চেষ্টা করলেও খুব তাড়াতাড়ি

এইসব কৃত্রিম বুদ্ধিসম্পন্ন রোবট আবার ঠিক করে কাজ করতে খুব তাড়াতাড়ি শিখে যায়।

ভুলো তাই একটাই। একবারই তৈরি হয়েছে। আর তাই ওরা ওকে নিয়ে যেতে চায়। আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। আর রীমাদেবী সেটা ওনার জীবিত অবস্থায় হতে দেননি। তবে উনি না থাকলে কি হবে, সেটা পরিষ্কার।

ভুলো ইতিমধ্যে খানিকক্ষণের জন্য উঠে কোথায় যেন গিয়েছিল। ফের পাশে এসে বসেছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রীমাদেবীর মনে হল ভুলো যেন কাঁদছে। গভীর চোখের উপরে যেন শ্রাবণের মেঘের ছায়া। ভুলো রীমাদেবীর আরও গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতের উপরে হাত রেখেছে।

রীমাদেবী বলে উঠলেন—কোথায় গিয়েছিলি রে? মন খারাপ করছে?

ও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে উঠল—তুমি যাতে অন্য কোথাও চলে না যেতে পারো, তাই তোমার চটি, জুতোগুলো সব লুকিয়ে রেখে এলাম। সবকটা। দেখি এখন কি করে যাও।

—সেকি রে? কোথায়?

—আমাকে কি তুমি অতো বোকা পেয়েছ, যে তোমাকে সব বলে দেবো। আমি তোমায় কোথাও যেতে দেবো না মা। তুমি আমার কাছেই থাকবে।

রীমাদেবী টের পেলেন ওনার শাড়ির আঁচলে টান। ভুলোর হাতের টান। আর সেই হাতের টানে ওনার মনে হল ঘুম আসছে। সেই ঘুম যা ওনাকে এখনও জীবনের স্বপ্ন দেখায়। একদল উড়ে আসা পাখির ডানায় নীল আকাশ ফের যেন ঢেকে যাচ্ছে। একটা সাদা মেঘ চোখের সামনে ভেসে আসে। ওই তো, তার ভুলোর মতো চোখ, ভুলোর মতো ঝাঁকড়া চুল, ভুলোর মতো হাসি।

অ্যাকিনেটপসিয়া

—দাদা, কাছাকাছি কোনো পেট্রোল পাম্প আছে?—পাশ দিয়ে একটা লোক সাইকেলে উলটো দিকে যাচ্ছিল। গাড়ি থামিয়ে তাকেই জিজ্ঞেস করল অরিজিৎ। অরিজিৎ আমাদের গাড়ির ড্রাইভার।

চুপ করে একটু ভাবল লোকটা। তারপরে বলে উঠল—খুব কাছাকাছি নেই। গাড়িতে মিনিট দশেক পড়বে। সোজা এগিয়ে যান। হাবিবগঞ্জের মোড়টা পেরোনোর পরেই ডানদিকে পড়বে। বেশ বড়ো পেট্রোল পাম্প। কিন্তু একটু খেয়াল না করলে মিস করে যাবেন—লোকটা উৎসাহের সঙ্গে আরও অনেক বিবরণ দিতে শুরু করল। আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে ফের রওনা হলাম।

—তা অরিজিৎ, কোন অসুবিধে হবে না তো? অতদূর যাওয়ার মতো তেল আছে? —বিশ্বজিৎ দা ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে জিজ্ঞেস করে উঠল।

—হ্যাঁ, দাদা। কোনো সমস্যা নেই। ওই লাল দাগের নীচে চলে গেলেও দশ কিলোমিটার হেসে খেলে চলে যায়।

এখন সকাল এগারোটা বাজে। মে মাস। বাইরের চড়া রোদের উত্তাপ গাড়ির এসিকেও কোণঠাসা করে ফেলেছে। বাইরে জোর হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তার পাশের গাছগুলো ধুলো মেখে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

শনিবারের আসর থেকে আমরা সবাই মিলে হাজারদুয়ারী যাচ্ছি। বহুদিন পরে একসঙ্গে কোথাও যাচ্ছি। কলকাতা থেকে ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। আমরা সবাই তো আছি, সঙ্গে আছে বিশ্বজিৎদা আর অনিলিখাও। অনিলিখাকে সঙ্গে পেতে অবশ্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। অনিলিখা আজকাল খুব ব্যস্ত থাকে। পাঁচদিন অফিস। আর বাকি দু'দিন সমাজসেবা। কখনও বৃদ্ধাশ্রমে বুড়ো-বুড়িদের সঙ্গে সময় কাটানো, কখনও রক্তদান শিবির আয়োজন, তো

কখনও অনাথ আশ্রমে বাচ্চাদের সঙ্গে। শনি-রবিবারও দেখা পাওয়া ভার। হাজারদুয়ারী বলে তাও রাজি হয়েছে।

অনিলিখাদির মুখেই শুনলাম হাজারদুয়ারীর দরবার হলের ঝাড়বাতিটা নাকি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। একমাত্র বাকিংহাম প্যালেসের ঝাড়বাতিটা দরবার হলের ঝাড়বাতির থেকে বড়। ওটার একটা বিচিত্র ইতিহাসও শুনলাম অনিলিখাদির মুখে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

আজকে আমরা বহরমপুরে গিয়ে থাকব। কালকে হাজারদুয়ারী প্যালেস, বড়ো ইমামবড়া দেখে পরশু কলকাতা ফেরার প্ল্যান।

অনিলিখা জানলার ধারে বসে মাঝে-মধ্যে সোহিনীর সঙ্গে টুকটাক কথা বলে যাচ্ছে।

প্রতীকই হঠাৎ বলে উঠল—অনিলিখাদি, এবার একটা গল্প হয়ে যাক। এখনও তো অনেকক্ষণের পথ।

ভাগ্যিস প্রতীক মনে করাল। তা না হলে ভুলেই গিয়েছিলাম, অনিলিখাদির গল্প শোনার কথা।

অন্য সময় অনিলিখাদিকে গল্প বলতে বললে বেশিরভাগ সময় বলে, সময় নেই। আজ অন্তত সেরকম বলার উপায় নেই। পরশু অব্দি আমাদের সঙ্গে থাকতেই হবে।

—তা অনিলিখা, একটা গল্প শুরু হয়ে যাক। তুমি এবং অন্য গ্রহের কোনো জীব, বা তুমি ও হিটলার, এরকম কিছু—বিশ্বজিৎদা ঠোঁটের কোণে একটা হাসি এনে ঘাড় ফিরিয়ে একবার অনিলিখাকে দেখে বলে উঠল।

অনিলিখাদি কথাটা শুনে মুচকি হেসে বলে উঠল—তা তোমরাই ঠিক করে বল, কিসের গল্প চাই?

আমরা অনিলিখাদির প্রশ্নটা শুনে খানিকটা অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। এমনিই অনিলিখাদির মুখে গল্প শোনা ভাগ্যের ব্যাপার। সেখানে তার মধ্যে আবার চয়েস।

—যা ইচ্ছে, তোমার যা মন চায়, তাই বল।—আমিই বলে উঠলাম। বাকিরাও তাতে সায় দিল।

—তাহলে এখনকার এই পরিস্থিতি নিয়ে, মানে গাড়ির তেল ভরা নিয়েই একটা গল্প হয়ে যাক, কি বলিস?

—মানে? গাড়িতে তেল ভরা? তা দিয়ে আবার কি গল্প হবে?—একটু হতাশ হয়েই বলে উঠলাম। —না, না, অন্য কিছু নিয়ে গল্প বল।

—শুধু তেল ভরা অবশ্য নয়, আরও অনেক কিছু আছে। শুনেই দেখ না—অনিলিখাদি একটু জল খেয়ে নিয়ে শুরু করল—

ম্যাট পামার নাম ছিল ছেলেটার। আমেরিকায় থাকাকালীন কয়েক মাসের জন্য আমার সঙ্গে আলাপ। তখন ওর বয়স কতই বা হবে! একুশ কি বাইশ! কিন্তু তখনই বেজায় মোটা। একশো কেজির বেশি ওজন। আমেরিকায় এটা অবশ্য খুব ব্যতিক্রমী কিছু নয়। এরকম মোটা অনেককেই দেখা যায়। ওর মুখ-চোখে সবসময় একটা ছেলেমানুষি হাসি লেগে থাকত। ছোট ছোট চোখ, ছোট করে ছাঁটা চুল। গালগুলো ফোলা ফোলা। দেখে মনে হত ক্লাস টেন পেরিয়ে সোজা চাকরি করতে চলে এসেছে।

সারাক্ষণ কিছু না কিছু খেতে থাকত। যেখানেই বসত, চারদিকে খাবার জিনিস ছড়ানো থাকত। কোকের বোতল, চকলেট, স্যান্ডউইচ। এমনিতে চুপচাপ। অন্যদের সঙ্গে কাজের বাইরে কথা কমই বলত। খাওয়াদাওয়ার বাইরে সব ব্যাপারেই খুব মিতব্যয়ী ছিল, যেটা ওই বয়সের আমেরিকানদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। গোটা কয়েক জামা ছিল, তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরত। বিশেষ দামি কিছুও ব্যবহার করত না। লক্ষ করতাম কিছু কিনলে, ঠিক যেটুকু দরকার ঠিক ততটাই কিনত। আর খুব ভালো ছবি আঁকত। চিত্রশিল্প নিয়ে বেশ ভালোরকম পড়াশোনা আর আগ্রহ আছে, তা বোঝা যেত। মাঝে-মধ্যে বিভিন্ন আর্ট একজিবিশনে ছবি দেখতে যেত।

আমি সেবারে মাসতিনেক মতো আমেরিকায় ছিলাম। দেশে ফিরে আসার পরে আর ওর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। ওর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আর যে কোনোদিন দেখা হবে তা ভাবিনি। কাকতালীয় ভাবে বেশ কয়েক বছর পরে দেখা হয়ে গেল। তবে আমেরিকায় নয়। অন্য মহাদেশে। ওয়েলসে।

আমি অফিসের কাজে তখন ব্রিস্টলে কিছুদিনের জন্য গেছি। একটা উইক এন্ডে আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নর্থ ওয়েলসের হলিহেড বেড়াতে গিয়েছিলাম। নর্থ ওয়েলসের এসব জায়গায় রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা খুব কম।

বেশিরভাগ সরু সরু পাহাড়ি পথ। মাঝে-মধ্যে সে পথ এতটাই সরু হয়ে গেছে যে উল্টোদিক থেকে গাড়ি হঠাৎ করে চলে এলে তাকে জায়গা দেওয়াও সম্ভব নয়। রীতিমতো চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা সবুজ উপত্যকা। শেষ বিকেলের ফুরিয়ে যাওয়া নরম আলোয় উপত্যকাগুলো যেন আরও মায়াবী হয়ে উঠেছে। দূরে ভেড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে। মাঝে-মধ্যে ছোট ছোট গ্রামের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। গ্রাম মানে অবশ্য গোটা কয়েক ছোট ছোট টালির বাড়ি, একটা পাব, আর একটা চার্চ।

শীতের সময়। বিকেল পাঁচটাতেই বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। হেডলাইটের আলো ছাড়া রাস্তায় আর কোনো আলো নেই। ফেরার পথে একটা পেট্রোল পাম্পে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তেল ভরছি, হঠাৎ দেখি পাশে একটা বড় এসইউভি এসে থামল। গাড়ি থেকে ম্যাট নামল। তখনও আগে যেরকম দেখেছিলাম, সেই একই রকমের মোটা। নেমে তাড়াহুড়ো করে তেল ভরতে এগিয়ে গেল। দেখে মনে হল যথেষ্ট উত্তেজিত। আমি ওর নাম ধরে ডেকে উঠলাম। প্রথমবারে সাড়া পেলাম না। আরেকবার জোরে ডেকে উঠলাম। এবার চমকে আমার দিকে তাকাল। একগাল হেসে আমার দিকে এগিয়ে এলো। চিনতে পারলেও প্রথমে আমার নাম মনে করতে পারল না। আমাকে অবশ্য 'অ্যানি' বলে ডাকত।

শুনলাম ও কিছুদিনের জন্য ওয়েলসে কাজে এসেছে। কার্ডিফে ছিল। তবে ওর এখানের কাজ আপাতত শেষ। গাড়িতে যাচ্ছে হলিহেড। অর্থাৎ আমরা যেখান থেকে ফিরছি, ঠিক সেখানেই যাচ্ছে ও। হলিহেড থেকে একটা ফেরি ধরে ও আজকেই আয়ারল্যান্ড যাবে।

লক্ষ করলাম ম্যাট খুব তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। জুতোর দড়ির লেসটা পর্যন্ত বাঁধেনি, যেটা ওর স্বভাববিরুদ্ধ।

কি কাজে ও এখানে এসেছিল সে প্রশ্নটার কোনো উত্তর দিল না। আমি হলিহেড থেকে আসছি শুনে, ও গাড়িতে তেল ভরতে ভরতেই আমাকে উলটো প্রশ্ন করে উঠল, এখান থেকে আর কতদূর?

—কেন গাড়িতে জি.পি.এস ছিল না? তোমাকে জিজ্ঞেস করার কি আছে?—বিশ্বজিৎদা বলে উঠল।

—না না, তখন আর জি.পি.এস কোথায়? ২০০০ সালের কথা বলছি। তখন জি.পি.এস টেকনোলজি হিসেবে এলেও খুব কম গাড়িতেই থাকত। সব জায়গার ডিটেলড ম্যাপ আর স্যাটেলাইট কভারেজ না থাকায় গাড়িতে ব্যবহার

হতই না বলা চলে।—একটু থেমে অনিলিখা ফের গল্পে ফিরল—তা ওকে বললাম, কুড়ি মাইল মতো রাস্তা।

ও তাড়াতাড়ি সেরকম তেল ভরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। শুধু বেরিয়ে যাওয়ার আগে গাড়ির থেকে মুখ বার করে বলে উঠল—পরে ফোনে কথা হবে। আজকে একটু ব্যস্ততা আছে। ফেরি মিস হয়ে যাবে। হলিহেডেই সারারাত। কাটাতে হবে সেক্ষেত্রে।

আমিও হাত তুলে ওকে বিদায় জানালাম। কিন্তু জানতাম ও আমাকে যোগাযোগ করবে না। ওর কাছে আমার ফোন নাম্বার নেই। মেল আইডিও নেই। কেন তাড়াহুড়ো করে বেরোচ্ছে তাও বুঝতে পেরেছিলাম।

—কেন?—আমরা প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম।

—একটা কথা বলা হয়নি। সেদিন সকালের কাগজে একটা খবর পড়েছিলাম। ইনফ্যাক্ট আমার গাড়িতে আমার বন্ধু সারিতার সঙ্গে সে ঘটনা নিয়ে কথা বলতে বলতেই তখন আসছিলাম। লন্ডনের বিখ্যাত ধনী স্যার ম্যাক্সের বাড়ির প্রাইভেট কালেকশন থেকে তার আগের রাতে বিখ্যাত ডাচ শিল্পী রেমব্রান্টের পেন্টিং চুরি হয়েছে। ১৬৫০ সাল নাগাদ আঁকা এই পেন্টিং। দাম প্রায় একশো কোটি টাকার কাছাকাছি। গতরাতে স্যার ম্যাক্সের বাড়িতে একটা পার্টি ছিল। সেখানে অন্য কয়েকজন আর্টকালেক্টারও এসেছিলেন। তার মধ্যে প্রায় সবাই স্যার ম্যাক্সের পূর্বপরিচিত। প্রত্যেকেই ছবির বড় সমঝদার। যাদেরকে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাদের ছবি পুলিশ বর্ণনা শুনে আঁকছে। সে ছবি কাগজেও খুব শিগগিরি বেরোবে।

এর বাইরে বাড়ির বয়লার সারাতে একজন মোটামতো লোক এসেছিল। তারও ছবি চুরির সুযোগ ছিল। তার সঙ্গে একটা বড় ব্যাগও ছিল। গার্ডের মতে তার নাকি দৃষ্টিশক্তির সামান্য সমস্যাও ছিল। মেশিনে চা নিতে গিয়ে দু'বার কাপে বেশি চা নিয়ে মাটিতেও ফেলেছিল। দৃষ্টিশক্তির এরকম সমস্যা থাকলে তার পক্ষে অবশ্য এভাবে ছবি চুরি করা অনেক শক্ত কাজ।

—তা, কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল না?

—না, না, ২০০০ সালে তখনও সিটিটিভি ক্যামেরার ব্যবহার তেমন ছিল না! তাও আবার এটা একজনের প্রাইভেট কালেকশান। সেসব জায়গাতে

তো থাকতই না। তাই অপরাধীর বিরবণ শুনেই শিল্পীর সাহায্যে ছবি আঁকা হচ্ছিল।

—তা হঠাৎ করে ম্যাটের কথা বলতে বলতে ছবি চুরির এই কথা?—আমি বলে উঠলাম।—ম্যাটের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল তার?

—হ্যাঁ, আমার দেখেই মনে হয়েছিল যে ম্যাটই ছিল সে চোর।

—মানে? ম্যাটই ছবিচোর? তা তুমি কি করে জানলে?—বিশ্বজিৎদা একটু থেমে ফের বলে উঠল—নাহ, অনিলিখা দেখছি শারলক হোমসকেও হার মানাবে!

—একে তো বর্ণনায় ছিল যে লোকটা মোটা। দুই, ম্যাটের ছবির প্রতি আগ্রহ। ছবির সমঝদার না হলে কেউ ওই ছবি চুরি করত না। সেটা আমি জানতাম। তিন, আর মূল কারণ, ম্যাটের একটা বিশেষ সমস্যা ছিল, যেটা আমি জানতাম। অ্যাকিনেটপসিয়া। এটা একটা বিরল রোগ। এ অসুখে কোনো কিছুর গতির সম্বন্ধে ব্রেন ঠিকভাবে ধারণা করতে পারে না। এটা দুর্বল দৃষ্টিশক্তির জন্য নয়। এটা একধরনের ব্রেন ডিস-অর্ডার। আমি আগে ওর মধ্যে এটা লক্ষ করেছি। তাই যখনই ও চা বা কফি কাপে ঢালত, অনেক বেশি ঢেলে ফেলত। আর অনেক সময় তা ওর হাতেই পড়ত। কাপে যে চা প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছে, তা ও আগে খেয়াল করতে পারত না। আসলে এই বিরল অসুখে রোগী পুরো ফ্লো-টা ঠিকভাবে দেখতে পায় না। কিছু কিছু মুহূর্তের বিচ্ছিন্ন ছবি দেখে। তাই কাপে চা-এর লেভেলের আন্দাজটা করতে পারে না।

ওকে এতো তাড়াহুড়ো করতে দেখে আমার প্রথম সন্দেহ হয়। এটা ওর স্বভাববিরুদ্ধ। ও ধীরে-সুস্থে কাজ করার ছেলে। এমনিতেই জানতাম ম্যাট ছবি—চিত্রশিল্প খুব ভালো বোঝে। তাই ওর পক্ষে চুরি করা সম্ভব ছিল।

—তা এত কিছু বোঝার পরেও তুমি কিছু করলে না? অপরাধীকে চলে যেতে দিলে? বন্ধু বলে? এটা কিন্তু ঠিক নয়—সোহিনী বলে উঠল।—আমি হলে ঠিক ধরিয়ে দিতাম, তা সে যত বড়ো বন্ধুই হোক না কেন!

অনিলিখা চুলে লাগানো সবুজ হেয়ারক্লিপটা খুলতে খুলতে বলে উঠল—

—না, না, চলে যেতে তো দিইনি। আর তাই ওখান থেকে হলিহেডের দূরত্ব কত, সেই মাইলের হিসেবটা ভুল বলেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, ওই পথে পরবর্তী ৫০ মাইলের আগে অন্য কোনো পেট্রোল পাম্প ছিল না। ফাঁকা রাস্তা।

হলিহেড ছিল আরও ৫০ মাইল দূরে। আমাদেরও তেলের সমস্যা হয়েছিল। তাই আরও বেশি করে খেয়াল করেছিলাম যে পথে কোন পেট্রোল পাম্প নেই।

—তা, তারপরে কি হল?

—আর কি হবে? আমিও বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই পুলিশে ফোন করেছিলাম। জানিয়েছিলাম যে ওখান থেকে মাইল কুড়ি দূরে একটা দাঁড়িয়ে পড়া গাড়িতে ওরা ম্যাটকে অর্থাৎ ছবিচোরকে খুঁজে পাবে। ম্যাটের সঙ্গে গাড়িতে থাকা রেমব্রান্টের পেন্টিংও উদ্ধার করতে পারবে। পরে খবর পেয়েছিলাম, হয়েছিলও ঠিক তাই।

এতক্ষণে অনিলিখা থামল।

একেই বলে টাইমিং। আমাদের গাড়িও এতক্ষণে পেট্রোল পাম্পে এসে গেছে। অরিজিৎ বিশ্বজিৎদাকে জিজ্ঞেস করে উঠল—কতটা ভরব স্যার?

বিশ্বজিৎদার সঙ্গে আমরাও গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—একদম ভর্তি।

পরজীবী

'ইথোলজি' কথাটার অর্থ জানো গণেশ? মিস্টার পাই বইয়ের পাতা উল্টোতে উল্টোতে বলে উঠলেন।

জীব-জন্তুদের স্বাভাবিক ব্যবহারের উপরে সায়েন্টিফিক স্টাডি, তাই না?

চমৎকার। কি করে জানলে?

একটা বই পড়েছিলাম এ বিষয়ের উপরে।

হ্যাঁ, খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়। তার মধ্যে আবার নিউরো-ইথোলজি—সহজ বাংলায় বলতে গেলে যা বোঝায় তা হল জীব-জন্তুদের নার্ভকোষ কিভাবে ওদের স্বাভাবিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা এখনো এ বিষয়ের অনেক কিছুই জানি না। এই যেমন ধরো আরশোলা। সারাক্ষণ আমাদের চোখের সামনে ঘোরাঘুরি করছে, অথচ আমরা কিছুই জানি না ওদের সম্বন্ধে। আরশোলা ধরা চাট্টিখানি কাজ না, সেটা তো নিশ্চয়ই জানো। ওরা সামান্যতম বাতাসের গতি পরিবর্তনও টের পায়। আমেরিকার জঙ্গলে ওদের প্রধান শত্রু হল ব্যাঙ। ব্যাঙ মুখের থেকে জিভ বার করার আগেই, ওই সামান্য সময়ের মধ্যেই ওরা বাতাসের পরিবর্তন বুঝতে পারে। আর শুধু তাই নয়, তার ৫০ মিলিসেকেন্ডের মধ্যে সেই অনুযায়ী অন্যদিকে উড়ে যেতে পারে। ছ'টা পা ঠিক সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে উড়ে যাওয়া, সহজ কথা নয়! এয়ারকারেন্টের এই সামান্য তারতম্য বোঝার জন্য ওরা যে সেনসরি অর্গান ব্যবহার করে, তার নাম হল ফিলিফরম সেন্সিলা, যা ওদের শরীরের একদম শেষ অংশে থাকে। আর তার জন্যই—

মিস্টার পাই-এর কথায় বাধা এল। কলিংবেল বেজে উঠেছে। কেউ একজন বাইরের গেটে এসেছে।

বাইরের দরজায় রাখা ক্যামেরায় এই নতুন আগন্তুকের ছবি দেখে গণেশ অবাক হয়ে বলে উঠল, একটা বাচ্চা ছেলে। সরস্বতী পুজোর চাঁদা নিতে এসেছে হয়তো। বলে উঠে দাঁড়াল।

খানিক বাদে গণেশ আবার ফিরে এল। তবে একা নয়। সঙ্গে একটা বছর দশেকের ছেলে। হাফ প্যান্টের উপরে একটা লাল-কালো হাফহাতা শার্ট। উজ্জ্বল চোখ। নাকটা একটু ভোঁতা মতো। ফর্সা রঙ। মুখটা বেশ সুন্দর।

মিস্টার পাই একটু অবাক হয়ে গণেশকে বলে উঠলেন, কী ব্যাপার?

ছেলেটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। গণেশ উত্তর দিল, ও চাঁদা নিতে আসেনি। ওর বন্ধুকে খুঁজে পাচ্ছে না। কি তাই তো? তা কী নাম যেন তোমার?

রাজর্ষি।

আহা, দাঁড়িয়ে আছ কেন। বসো। মিস্টার পাই সস্নেহে ডেকে নিলেন ছেলেটাকে।

ছেলেটা একটু দ্বিধা নিয়ে সোফায় বসে বলে উঠল, রোমিতকে খুঁজে পাচ্ছি না। কাল থেকে।

রোমিত কি তোমার বন্ধু?

হ্যাঁ, আমার খুব বন্ধু। ও আর আমি সবসময় একসঙ্গে ঘুরি। সবাই বলে নন্টে-ফন্টে। কাল সকাল থেকে ওকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।

তা ওর বাবা-মা, নিকটাত্মীয় তারা কি বলছে? তারা খোঁজাখুঁজি করছে না? ও কোথায় থাকত? সেখানে খোঁজ করেছ?

হ্যাঁ, ওই যে গো, পোড়ো মাঠ আছে না, তার কাছে একটা ডোবা আছে। তার পাশের বাড়িতে ও থাকত। ও আর ওর দিদিমা। ওর বাবা-মা কেউ নেই। ও দিদিমার সঙ্গেই থাকত। তা আজকে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কেউ নেই। ওর দিদিমাও নেই বাড়িতে।

তাহলে হয়তো ওরা কোথাও বেড়াতে গেছে।

না, ও বাইরে কোথাও যায়নি। তাহলে আমি ঠিকই জানতাম। ও সব কথা আমাকে বলে। সব দোষ ওই পাথরটার। আমাকে তো ও বলেছিল পাথরটা ফেলে দেবে। জানি না সেজন্য কোনো বিপদে পড়েছে কিনা।

কিন্তু আমি তো আর পুলিশ নই, ডিটেকটিভও নই। তোমার বন্ধুকে খুঁজে দিতে পারব, সে কে বলল?

নবাদা। বলল তোমার কাছে আসতে।

কে? নবা পাগলা? হেসে উঠল গণেশ। তুমি আর জিগ্যেস করার লোক পেলে না!

মিস্টার পাই-এর দিকে তাকিয়ে ছেলেটা ফের বলে উঠল, আসলে রোমিতকে খুঁজতে দেখে নবাদাই তো এগিয়ে এসে আমাকে বলল। বলল, তুমি খুব বড় সায়েন্টিস্ট। ওই পাথরটা দেখলেই নাকি তুমি বুঝতে পারবে রহস্যটা কোথায়। তাই তো তোমার কাছে আসা!

কোন পাথর? বলো তো খুলে। মিস্টার পাই নড়েচড়ে বসলেন।

দু'দিন আগে স্কুল থেকে ফেরার পথে রোমিত আমাকে একটা পাথরের কথা বলেছিল। তারপরে আমি ওর বাড়ি যাই। আমি নিজের চোখে দেখেছি। একবার হাতেও ধরেছিলাম। একটা কালো মতো পাথর। একটা ফুটবলের মতো সাইজ। খুব ছোট ছোট ফুটো তাতে। যেন কিছু দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে পাথরটাকে। পাথরের তুলনায় হালকা। অনেকটা মৌচাকের মতো। ওটা ও পুকুরের ধারে একটা বড় গর্তের মধ্যে পেয়েছিল।

তা পাথর তো অনেক রকমই হয়। ওই পাথরে আবার কী অসুবিধে হল?

ওটা নেওয়ার পর থেকেই তো সব কিছু অন্যরকম হতে লাগল। ও কেমন যেন বদলে গেল।

একটু থেমে ছেলেটা আবার বলে উঠল, পরশু আমরা স্কুলের পরে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলাম। ও বারবার পড়ে যাচ্ছিল। এমনিতে খুব ভালো স্ট্রাইকার। খুব জোরে দৌড়োয়। তা খেলার পরে ও বলেছিল কে যেন ওর পা টেনে ধরছে। তাই ঠিকমতো ছুটতে পারছিল না। ফেরার সময় অন্ধকার হয়ে এসেছিল। কিন্তু তা হলেও দেখতে পাওয়া যাবে না, এমন নয়। কিন্তু ও যেন মাঝে-মধ্যেই জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল।

ওইটুকু সময়ের মধ্যেই!

হ্যাঁ, ও খুব তাড়াতাড়ি পালটে যাচ্ছিল। অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল প্রতি মুহূর্তে আমার চোখের সামনেই ও বদলে যাচ্ছে আর আমি তা বুঝতে পারছি না। আর কী সাংঘাতিক বিপদ হবে বল। দু'দিন বাদে আমাদের স্কুলের সঙ্গে ঘাটপাড়া হাই স্কুলের খেলা। ও যদি খেলতে না পারে, আমরা ডাহা হারব!

মিস্টার পাই উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলেন। মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। তারপর কী ভেবে দাঁড়িয়ে গেলেন। বলে উঠলেন, তা তোমার সঙ্গে কে থাকে? তোমার বাবা-মাকে কি এই ঘটনা জানিয়েছ?

না, আমারও বাবা-মা নেই। আমি মামাবাড়িতে থাকি।

ছেলেটা একটু চুপ করে উদাস ভাবে ফের বলে উঠল, রোমিতই আমার একমাত্র বন্ধু। ওকে খুঁজে বার করতেই হবে।

তোমার কাছে তোমার বন্ধুর কোনো ছবি আছে?

হ্যাঁ, এই যে। জামার পকেট থেকে একটা রঙিন ছবি বার করে দিল ছেলেটা। আমরা দুজনেই আছি ছবিতে। স্কুলে তোলা হয়েছিল।

মিস্টার পাই ছবিটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন। রোমিতের রং বেশ কালো, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল। চোখ দুটো ছোট ছোট, কৌতূহলমাখা, যেন অনেক প্রশ্ন লুকিয়ে আছে তাতে। মুখে একটা কাটা দাগ। সব মিলিয়ে মুখের মধ্যে যেন শিশির-ভেজা ভোরের সারল্য।

চলো, আমরা আগে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করি। ওরা ঠিক রোমিতকে খুঁজে বার করবে। আর আমাদের পাথরটাও খুঁজে পেতে হবে। ওটাকে কোথায় দেখেছিলে শেষ?

ওটা তো ওর স্কুলের ব্যাগে ছিল।

ঠিক আছে। গণেশ তুমিও চলো সঙ্গে। বলে মিস্টার পাই উঠে দাঁড়ালেন।

২

কিন্তু পুলিশকে জানিয়েও কোনো লাভ হল না। এর পরে পুরো একদিন কেটে গেছে। রোমিতের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। খোঁজ পাওয়া যায়নি

ওর দিদিমারও। ওর এক মামা পুনেতে থাকে। সেখানেও খবর নেওয়া হয়েছে। ওরা সেখানেও যায়নি।

পুলিশ অবশ্য ব্যাপারটাকে তেমন কিছু গুরুত্ব দিতে চায় না। একদিন-দু'দিনের জন্য খোঁজ না পাওয়াটা বড় কিছু ব্যাপার নয়। বিশেষ করে পরিবারের কেউ যখন খোঁজ করেনি এক্ষেত্রে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে যারা নিখোঁজ হয়, তারা দু-তিনদিনের মধ্যেই ফিরে আসে। পাথরটারও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে ওই পাথরটা যেখানে পড়েছিল, সেই জায়গাটা মিস্টার পাইকে রাজর্ষি দেখিয়েছিল। পুকুরের ধারে ঝোপের কাদামাটির মধ্যে একটা একফুট মতো জায়গা জুড়ে তিনফুট গভীর গর্ত। সেখানেই নাকি রোমিত খুঁজে পেয়েছিল পাথরটাকে। হয় পাথরটা কেউ আগে থেকেই মাটিতে পুঁতে রেখে গিয়েছিল অথবা এখানে হঠাৎ আকাশ থেকে এসে পড়েছে। উপরের অর্জুন গাছটার ভাঙা ডালটার দিকে আর চারপাশের দিকে তাকিয়ে মিস্টার পাই-এর মনে হল দ্বিতীয় ধারণাটাই ঠিক। আকাশ থেকেই এসে পড়েছে। তবে কি ওটা কোনো মেটিওরাইট ছিল? তাহলে পাথরটা পাওয়া জরুরি দরকার। কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে দেখা দরকার কী ছিল তাতে! তবে পাথরটা হাতে না আসা পর্যন্ত কিছুই বোঝার উপায় নেই। এটাও জানার উপায় নেই সেদিন যখন এটা এসে পড়েছিল, তখন তার এই প্রচণ্ড বেগে এসে মাটিতে পড়ার সংঘাতের শব্দ কারুর কানে যায়নি কেন?

মিস্টার পাই সাধারণত বাজার করতে যান না। চিরকাল গণেশই করে। কিন্তু এক সপ্তাহ আগে একবার বাজার করতে এসে খুব ভালো লেগে গেছে। তাই তারপর থেকে রোজ ভোরবেলা বাজার করতে আসছেন। আজ বাজার করতে এসে লেবু কিনছেন, এমন সময় পাশ থেকে রাজর্ষির গলা পেলেন।

রোমিতকে কাল রাতে খুঁজে পেয়েছি কাকু।

মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন মিস্টার পাই। রাজর্ষির মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সে তো দারুণ খবর! কোথায় দেখা হল?

ও ওর বাড়িতেই ফিরে এসেছে।

দেখেছ? শুধু শুধু চিন্তা করছিলে। বললাম না ফিরে আসবে। তা কোথায় গিয়েছিল?

দূরে কোথাও যায়নি। এখানেই ছিল। ওকে শুধু চিনতে পারিনি। ওই আমাকে ডাকল। আমি আসি কাকু। পরে কথা হবে। বলেই, ফের প্রশ্ন করার আগে ছুট দিল রাজর্ষি।

গণেশ পাশ থেকে বলে উঠল, যাক বাবা। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ওর তাহলে কিছু হয়নি। যা চিন্তায় ছিলাম। আর পুলিশও কোনো কাজের নয়। এখানেই আছে। অথচ ওরা খোঁজ দিতে পারল না।

কিন্তু তুমি কি কিছু লক্ষ করলে? রাজর্ষিকে একটু অন্যরকম লাগল না! মিস্টার পাই অবাক হয়ে বলে উঠলেন।

না, আমার তো সেরকম কিছু লাগল না।

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন মিস্টার পাই। শুধু বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, নাহ, আমিই হয়তো ভুল ভাবছি।

ফের গণেশকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, আজকে দুপুরে কলকাতা থেকে আমার কয়েকজন বিজ্ঞানী বন্ধু আসছেন। ওঁরা চলে যাওয়ার পরে পারলে আজকে বিকেলে রোমিতের বাড়ি যাব। ওই ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করা যাবে। পাথরটাও দেখা যাবে।

সেদিন অতিথিদের বেরোতে বেরোতে পাঁচটা বেজে গেল। তাঁরা চলে যাওয়ার পরে মিস্টার পাই গণেশকে নিয়ে রোমিতের বাড়ির দিকে এগোলেন। বাড়ির রাস্তাটা গণেশের চেনা। পোড়ো মাঠের কাছে একটা ছোট ডোবার ধারে ওদের একতলা বাড়ি। বাড়ির পাশে একটা বড় বাঁশবন। বাইরে থেকেই অনটনের ছাপ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। বাড়ির আরেকটু কাছাকাছি আসতেই আরো অবাক হলেন মিস্টার পাই। বাড়ির দেওয়াল বেয়ে একটা বড় লতানে গাছ উঠেছে। আর দরজার ফাঁক দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে। গাছটা পাতাবহুল। কিন্তু সবই যেন কচি পাতা। পাতায় পাঁচটা করে খাঁজকাটা। পাতায় ঘন সবুজের মধ্যে সামান্য হলদেটে ভাব। সরু সরু ডালের দু'ধারে দুটো করে পাতা। দেওয়াল বেয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে চলে গেছে।

তাহলে কি ভুল বাড়িতে এলেন? এ বাড়িতে মাসখানেকের মধ্যে কেউ থেকে থাকলেই অবাক হওয়ার কথা।

কী ব্যাপার গণেশ? এটাই সে বাড়ি তো?

হ্যাঁ, তাই তো মনে হয় স্যার। এ ছাড়া তো এখানে আর কোনো বাড়ি নেই।

বাড়িতে তো কেউ নেই। এখানে গত দশ দিনেও তো কেউ এসেছে বলে মনে হয় না। দরজা বন্ধ। ভেতরে কোনো আলো জ্বলছে না। দেখো তো একবার ধাক্কা দিয়ে।

উৎসাহের চোটে গণেশ একটু জোরেই ধাক্কা দিল। অতটা জোর ধাক্কা না দিলেও চলত। দরজাটা খুলে গেল। ছোট একটা ঘর। সামান্য আসবাব। একটা আধভাঙা চেয়ার। কিছু বই একটা চৌকির উপরে রাখা। মাটির উপরে একটা চাটাই পাতা। ঘরের অন্য কোণে দেওয়াল জুড়ে আরেকটা লতানে গাছ। বাইরে থেকে আসা লতানে গাছটা দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকে দেওয়াল বেয়ে ওই অন্য লতানে গাছটার দিকে এগিয়ে গেছে। সেটাও একই রকম। শুধু পাতাগুলো খানিকটা বিবর্ণ।

ঘরের দরজা খোলা রেখে কেউ দূরে কোথাও যাবে, এটা ভাবা যায় না। অন্য দুটো ঘর আর বাথরুমটা একবার ঘুরে এলেন মিস্টার পাই। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। রান্নাঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখা আছে।

রান্নাঘরের দেওয়ালেও ওই একই রকমের লতানে গাছ হয়েছে। তবে এটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় শাড়ি শুকোতে দেওয়া আছে। আর যাই হোক নিশ্চয়ই দূরে কোথাও যায়নি। কাছাকাছিই আছে। রাজর্ষি তো আর ভুল বলবে না। হয়তো অন্য কারুর বাড়ি দুজনে মিলে খেলতে গেছে। আর দিদিমাও যে বাড়িতেই বসে থাকবেন তাও নয়। বাড়িতে টিভি নেই। আজকাল সবার যা টিভির নেশা, আশেপাশে অন্য কারুর বাড়িতে টিভি সিরিয়াল দেখতে যাওয়াটা ওনার পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

ঘর থেকে বেরোনোর সময় মিস্টার পাই একটু চমকে উঠলেন। বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকা লতানে গাছটা অন্য লতানে গাছটার উপরে এসে পড়েছে। যখন ঢুকেছিলেন, যদ্দূর মনে পড়ে তখন দুটোর মধ্যে দূরত্ব ছিল। ঘরের মধ্যের গাছটার রং কেমন যেন বিবর্ণ, ম্লান হয়ে গেছে। আর ভেতরে ঢোকা লতানে গাছটায় সে তুলনায় যেন যৌবনের দীপ্তি।

গণেশ, এটা কি আগে এরকমই ছিল?

আগে খেয়াল করিনি স্যার। তবে এরকমই ছিল বোধহয়। গাছ কি অতো তাড়াতাড়ি বাড়বে স্যার?

অবাক হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন মিস্টার পাই। গাছের পাতাগুলো যেন হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে ওনাকেও। খানিক বাদে ওনারা বাইরে চলে এলেন। বাইরে পড়ন্ত আলোর শেষ ছোঁয়ায় রঙিন হয়ে উঠেছে বাঁশঝাড়গুলো। ঘরে ফেরা পাখির ডানায় মুখ ঢাকছে রক্তিম হয়ে ওঠা নীল আকাশ।

কিছু দূরে নবা পাগলা একটা বাঁশঝাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গে একটা ঘেয়ো কুকুর থাকে। সেটাও যথারীতি আছে। ওদের দেখেই নবা এগিয়ে এসে বলে উঠল, স্যার, দেখলেন তো কী কাণ্ড! খুব বন্ধু ছিল ওরা। তাই ঠিক খুঁজে বার করেছে। একটু থেমে ফের বলে উঠল, সব নষ্টের গোড়া ওই পাথরটা। আমি আজকে ওটাকে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছি। দূর যা! সব আলিয়েন খতম।

কোথায়?

ওই, ওই ওখানে। আর ওটা কারুর হাতে আসবে না। ব্যাটা, বড় লোভী। সবসময় প্রাণ খোঁজে। সবসময় বাঁচতে চায়। একটার পর একটা। বলে বিড়বিড় করতে করতে ফের এগিয়ে গেল ডোবাটার দিকে। তারপরে চিৎকার করে উঠল, নবাকে চেনো না! দিয়েছি তো জলের মধ্যে ডুবিয়ে। ওই ছোট ছোট ছেলে দুটো তোর কী ক্ষতি করেছিল! বলে বিড়বিড় করতে করতে ডোবার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল।

৩

সকালের কাগজটা মন দিয়ে পড়ছিলেন মিস্টার পাই। নামকরা দৈনিকের তৃতীয় পাতার খবর।

‘রহস্যজনক ভাবে উধাও দুই স্কুল-পড়ুয়া।’

স্যার, আপনি কি ওদের বলে দেবেন যে ছেলেটা বন্ধুর খোঁজে আপনার কাছেও এসেছিল? তারপরে দু’দিন বাদে বলেছিল বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছে।

তারপরে আবার দুজনেই উধাও। নবা পাগলাকেও তো দেখা যাচ্ছে না আর তারপর থেকে।

নাহ্, ওরা জেনেই বা কী করবে! কিছু কাজের কাজ তো আর ওদের দ্বারা হবে না। আমাকেই আরও অনেক কাজ করতে হবে। জানতে হবে কী ছিল ওই পাথরে?

যদি পাথরটা পেতেন একবার। তোলার চেষ্টা করব পুকুর থেকে? ওটা কোথা থেকে এল জানতে খুব ইচ্ছে করছে।

পাইনি কে বলল? তার পরের দিন আমি ওটা ওই ডোবা থেকে উদ্ধার করেছি। ল্যাবে খুব যত্নসহকারে রাখা আছে। কিছু পরীক্ষাও করে দেখেছি।

সেকি স্যার? আমাকেও জানাননি ব্যাপারটা! তাই তো ভাবছি আপনি একা একা কী কাজ করছেন ল্যাবে এ ক'দিন? তা স্যার, আমার তো সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী ছিল মনে হয় আপনার?

সিম্পল। পাথরটা হল একটা উল্কাপিণ্ড বা মেটিওরাইট। কোনোভাবে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে এসে এখানে এসে পড়েছিল। তবে তাতে কোনো প্রাণ ছিল। হয়তো কোনো অ্যালিয়েন ভাইরাস। আর সে ভাইরাসে প্রথমে আক্রান্ত হল রোমিত। সঙ্গে খুব সম্ভবত ওর দিদিমাও। কিন্তু আক্রান্ত হলে তো সেই শিকার খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে। তাই ভাইরাসের দরকার পড়ল আরেকজনকে, যার মধ্যে সে আক্রান্তের মৃত্যুর পরে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। প্যারাসাইটের মতো প্রথমে ভর করল রোমিতের উপরে। দু'দিনের মধ্যে রোমিত মারা গেল। মারা যাওয়ার আগে সে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ল তার পরবর্তী শিকারে। রাজর্ষির মধ্যে। তবে ঐ ভাইরাস আর ঐ পাথরের মধ্যে নেই।

কিন্তু ওদের ডেডবডিগুলো গেল কোথায়?

সেকি? তুমি তা এখনও বোঝোনি! নবা পাগলা কিন্তু বুঝে গিয়েছিল।

কোথায় স্যার? ডেডবডি কোথায়? ডোবায়?

আজকে ওই বাড়িতে গেলে দেখবে বাড়ির বাইরে আরেকটা লতানে গাছ হয়েছে। ঠিক যেরকম সেদিন গাছ দেখেছিলাম, ঠিক সেরকম। ওরকমই পাতা। যেন হাতের পাঁচটা আঙুল। তবে এটা অন্যগুলোর মতো উপরের দিকে না

উঠে বাড়িটাকে বেড় দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। নবাটার পাগলামি কি আর এত সহজে যায়! এখনও সেটাই রয়ে গেছে।

মিস্টার পাই উঠে দাঁড়ালেন।—কালকে ওই লতাটাও শুকিয়ে যাবে। ওই ভাইরাসের দরকার হবে আরেকটা মানুষের, আরেকটা শিকারের। হাজার হোক 'নিউরো-ইথোলজি' বলে ওই ভাইরাস ওর শিকার খুঁজে বার করবেই। ওর পরবর্তী শিকার। আজ রাতের মধ্যেই। প্রশ্নটা হল এবার কার পালা? আর কিভাবে তাকে ও খুঁজে বার করবে?

একটু থেমে ফের মিস্টার পাই বলে উঠলেন, জানি না। কে যেন আজকে আমাকে সমানে ডাকছে। স্যার স্যার বলে। মনে হচ্ছে যেন নবা পাগলার গলা।

——

চড়াই-এর গল্প

দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে জল এলো তুতানের। আজকেও দোকানটা বন্ধ।

পাশের মিষ্টির দোকানের একজন লোক রোজ ওকে দেখে। ও অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ওকে ডেকে বলে উঠল—দোকান বিক্রি হয়ে গেছে খোকা। আর খুলবে না।

—কেন?

—সে আমি কি জানি? ভালো চলছিল না মনে হয়।

মনটা একদম ভেঙে গেল তুতানের। বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। রোজ স্কুল থেকে ফেরার পথে এই দোকানে দাঁড়িয়েই একটা করে গল্প পড়ত তুতান। কী সুন্দর যে সেসব গল্প! আর কাকুও খুব ভালো ছিল। বড় গোল গোল চোখ। তার উপরে একটা মোটা কালো ডাঁটির চমশা। নিজেই দোকানে বসে সারাদিন বই পড়ত। প্রথম প্রথম ভয় লাগত তুতানের। ও বই না কিনে রোজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোনোদিন বকবে না তো?

নাহ, কোনোদিন বকুনি খেতে হয়নি। উল্টে যেন খুশিই হত। আরও বই বার করে দিত।

—এই নাও নতুন ভূতের বই। আর এটা বাঘের বই। সবে বেরিয়েছে—এগিয়ে এগিয়ে দিত বইগুলো তুতানের পড়ার জন্য।

পড়া শেষ হলে আবার জিজ্ঞেস করত—কিরকম লাগল?

তুতান ভালো বলতেই একগাল হেসে লোকটা বলে উঠত—বলেছিলাম না! তারপর আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত—আজকালকার লোক যা হয়েছে না! এসব ভালো গল্প পড়ার সময় আর নেই।

তুতানের যা গল্প পড়া, সবই প্রায় এখানে। আর এখানকার পড়া গল্পগুলোই ও ওর বোন পালীকে শোনাত রঙচঙ মাখিয়ে।

পালী বড় বড় চোখ করে শুনত। মাঝে মধ্যেই বলত—তারপর দাদা?

আর শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেত। সে প্রশ্নের ধাক্কা সামলাতেই অনেকক্ষণ কেটে যেত।

এখন আর কি করে তুতান ওকে নতুন গল্প বলবে?

ওরা দুজন এখন মামার বাড়ি থাকে। সেখানে থাকে মামা, মামী আর ঘোবলু। ঘোবলু হল বাড়ির বিড়াল। গোলগাল চেহারা। খয়েরি রঙ। দিনরাত শুয়ে শুয়ে ঘুমোয়।

মা মারা যাওয়ার পর থেকে মামার বাড়িতেই থাকে ওরা। কিন্তু মামী খুব রাগী। গল্পের বই কিনে দিতে বলবে, সে বলার সাহস হয় না ওদের।

তাও দু'দিন বলেছিল। দ্বিতীয়দিন মামী রেগে উঠে বলেছিল—কি, পড়াশোনা নেই বুঝি? গল্পের বই, আর গল্পের বই।

আর কোনও কথা বলেনি তুতান।

তাই ওর সব বই পড়া এই দোকানেই। তা সেটাও যদি বন্ধ হয়ে যায়!

স্কুল থেকে ফিরে আজকে খেলতে যেতেও ইচ্ছে হল না ওর।

মামা আর মামী দুজনেই কাজ করে। ফিরতে এখনও দেরি আছে। পালী ঘুমোচ্ছে। একতলায় কোণের দিকে রান্নাঘর। সেখানে বিস্কুট খেতে নেমে এলো তুতান।

মা রোজ গল্প শোনাত বোনকে। তাই এখনও গল্প শুনতে এতো ভালোবাসে পালী। ও এখনও স্কুলে যেতে শুরু করেনি। পরের বছর থেকে স্কুলে যাবে।

তা আজকে থেকে বোনকে আর কি গল্প শোনাবে ও? তুতানেরই তো আর নতুন গল্প জানা নেই। আর ও তো আর রবিঠাকুর নয়, যে ইচ্ছে হলেই নতুন কিছু লিখে ফেলবে।

নাহ, ভারী চিন্তার ব্যাপার। আনমনে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে গিয়ে লক্ষ করল সামনের আমগাছের উপরের ডালে একটা বড় কালো

লেজঝোলা পাখি এসে বসেছে। সরু ডাল। আর তাই ডালটা খুব দুলছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাখিটা সমানে ডালের এদিক থেকে ওদিক লাফালাফি করে যাচ্ছে। আচ্ছা, ওই পাখিটা কি শুধু মজার জন্য এসব করে যাচ্ছে? নীচে তো আরও শক্ত ডাল আছে। সেখানে আরাম করে বসতে পারে। ওর দুটো ডাল নিচে একটা চড়াই বসে আছে। চুপচাপ।

হঠাৎই ওর যেন স্পষ্ট কানে এলো বড় পাখিটা কথা বলছে। ওকে লক্ষ করে।

বলছে—আমি সব সময় চড়ুই-এর থেকে উপরের ডালে বসি। এখান থেকে, আমার রাজ্য থেকে, আমি সব চড়ুই তাড়াবো। আমিই এখন এখানকার রাজা।

ইতিমধ্যে আরেকটা চড়ুই উড়ে এসে বসতে যাচ্ছিল। বড় লেজঝোলা পাখিটা হিংসুটের মতো তাকে দেখেই তেড়ে গেল। আর চড়ুইটা তা দেখে বসার আগেই ফের উড়ে গেল। যাওয়ার সময় কি যেন বলে গেল বড় লেজঝোলা পাখিটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বড় লেজঝোলা পাখিটা তাড়া করল ওকে। দূরে কোথায় হারিয়ে গেল ওরা।

খানিক বাদে অন্য চড়ুইটা আবার ফিরে এলো।

এবারে ওই আগের চড়ুইটার পাশে ডালে বসে বলে উঠল—আর বিরক্ত করবে না। মংলুকে দেখে বেজায় ভয় পেয়েছে।

দূরে লাল রঙের বাড়িটার অ্যান্টেনার উপরে একটা চিল বসে আছে। এদিকেই তাকিয়ে। চড়াইয়ের দৃষ্টি লক্ষ করে ওটাই যে মংলু তা বুঝতে দেরি হল না তুতানের।

খানিক বাদে চিলটা এক পাক খেয়ে দূরে কোথায় চলে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চড়ুই উড়ে এসে রান্নাঘরের জানলার বাইরে বসল। দুটোর মধ্যে কোনটা আলাদা করে বোঝা মুশকিল। চড়ুইটা ঘরের ভেতরের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে সমানে লাফিয়ে যাচ্ছে।

চোখের দিকে তাকাতেই তুতান বুঝতে পারল পাখিটা কিসের দিকে তাকিয়ে আছে। রান্নার ওভেনের পাশে একটা আলু। ছোট আলু। কিন্তু তার গায়ের থেকে অনেকগুলো সাদা গাছ বেরিয়েছে। গাছগুলো নানান শেপের। তাদের থেকে সরু সরু ডাল বেরিয়েছে।

এবার যেন আবার চড়ুইটার কথা শুনতে পেল তুতান।

পাখিটা যেন স্পষ্ট বলে উঠল তুতানকে লক্ষ করে—আমাকে একটু ওই আলুটা বার করে দেবে? দাও না।

তুতান ওর দিকে তাকাতেই ফের বলে উঠল—আমাদের খুব বিপদ। একটু আলুটা চট করে বার করে দেবে। আবার ওই দুষ্টু পাখিটা আসবে। আমাদের হয়তো মেরেই ফেলবে।

তুতান অবাক হয়ে আলুটা নিয়ে জানলার বাইরে রেখে দিল।

চড়ুইটা আলুটা পেয়েই আলুর থেকে বেরিয়ে থাকা দুটো গাছ খুলে নিল। দুটোই প্রায় চার ইঞ্চির মতো বড়। সরু সরু ডাল বেরিয়েছে দুটো গাছের থেকে। ডালের শেষ দিকগুলো বেশ ধারালো। এবার সেটা মুখে নিয়ে চড়ুইটা আবার ওই ডালে ফিরে গেল।

বড় লেজঝোলা পাখিটা ফের উড়ে আসছে। চিলটা আর ধারেকাছে কোথাও নেই যে ওদের বাঁচাবে। কিন্তু চড়াই দুটো আলুর থেকে খুলে নেওয়া গাছ দুটোকে ঠোঁট দিয়ে তুলে ধরেছে আক্রমণ সামলানোর জন্য।

পাখিটা তবু এগিয়ে আসছে। জোরে উড়ে আসছে ওদের দিকে। চিৎকার করতে যাচ্ছিল তুতান। হাত চারেক দূরে এসে পাখিটা কি ভাবল কে জানে। একটা বড় বাঁক নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

স্পষ্ট চড়ুইদের আনন্দের চিৎকার শুনতে গেল তুতান। ডালের উপরে তারপরে সে কি নাচ ওদের।

নাহ, আজ আর ওর গল্পের অভাব হবে না। হয়তো কোনোদিনই না।

গল্প তো চোখের সামনেই ছড়িয়ে আছে। শুধু দেখতে হবে, শুনতে হবে। খুঁজে বার করতে হবে।

কি বল তোমরা? ঠিক তাই না?

মারগাম ক্যাসলে খানিকক্ষণ

কিছুদিন আগে একটা পত্রিকা থেকে আমার ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা জানতে চেয়েছিল। যতই বলি লেখার সময় নেই, ওনাদের নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া না করাই ভালো, তাদের আরও জেদ বেড়ে যায়। নাছোড়বান্দা। শেষে লিখতেই হল।

এক্ষেত্রে জানাই, ভূতের গল্প যাঁরা লেখেন, তাঁদের কাছে ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাওয়া একদমই ঠিক কথা নয়। এ যেন গয়লার কাছে দুধে জল আছে কিনা জানতে চাওয়া। তাও সেই পত্রিকার সদস্য সংখ্যার কথা মাথায় রেখে লিখেছিলাম, এটা ভেবে যে একথা পাঁচকান হবে না।

আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। ভূত কেন, ওই নামের কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। আমার কাছে ভূতো বলে একজন ড্রাইভার এসেছিল, তাকে কাজে রাখিনি। 'অদ্ভুত' আমার খুব প্রিয় শব্দের তালিকায় পড়ে। মাঝে-মধ্যেই বলি অদ্ভুত সুন্দর, অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এক ধরনের ভূত বিরোধিতাই বলতে পারো।

তা এবার আসল কথায় আসা যাক। একরকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। তাকে ভৌতিক বলব নাকি বলব না, সে বিচার তোমাদের উপরেই ছেড়ে দিলাম।

সাধারণত লেখার সময় একটা ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করি। পর্দা অকারণে নড়ে, ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে, টেবিলের নীচ থেকে হঠাৎ করে কারুর হাত বেরিয়ে আসে। সব মিলিয়ে পাঠকরা বলে পড়ার সময় গা ছমছম করছিল, একদম হিচককের সিনেমার মতো লেখা।

এক্ষেত্রে সেটা ইচ্ছে করেই করব না। ঠিক যেরকম হয়েছিল, কমা, ফুলস্টপ বাদ দিয়ে ঠিক সেভাবেই প্রকাশ করছি।

এটা বেশ কয়েকমাস আগের কথা। শীতের শেষ দিক। ঠান্ডা তখন বেশ ভালোই। ওয়েলসে মারগাম ন্যাশনাল পার্কে এক পুরোনো ক্যাসলে গিয়েছিলাম।

ক্যাসল বলতে আমরা যা ভাবি এটা ঠিক সেরকম নয়, বলা যায় ওই আদলে তৈরি ১৮০০ সালের একটা বিশাল প্যালেস। যিনি তৈরি করেছিলেন সেই ট্যালবট-এর নামেই পরে শহরের নাম হয় পোর্ট ট্যালবট। ব্রিটেনের স্টিল ইন্ডাস্ট্রির কেন্দ্রে ওয়েলেসের এই শহর। আর তাই টাটা গ্রুপ টাটা স্টিল বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে এই শহরের ৯৯ শতাংশ লোক কাজ হারাবে। তাদের জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই স্টিল ইন্ডাস্ট্রির উপরেই নির্ভর করে। আর তাই যে সময়ের কথা লিখছি সেই সময় এ নিয়ে এ শহরের নাম ইংল্যান্ডের কাগজে রোজই শিরোনামে উঠে আসছিল।

ক্যাসলটা শহরের খানিকটা বাইরে। হাজার একরের বন-জঙ্গল ঘেরা জায়গার মধ্যে এই বিশাল প্যালেস। আমি যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন কেন জানি না লোকের ভিড় একেবারেই ছিল না।

সকাল দশটা নাগাদ বিশাল গোথিক আর্কিটেকচারের ওই ক্যাসলের সামনে যখন পৌঁছলাম, তখন আমি ছাড়া ওখানে আর কেউ ছিল না। কাঠের বিশাল দরজা সামান্য খোলা। দরজা ঠেলে খুলে মাঝের সামান্য পথ পেরিয়ে মূল বিল্ডিং-এর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিছুটা এগোতে দেখলাম একটা চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। তাতে লাল কার্পেট পাতা। কিন্তু কার জন্য এ কার্পেট পাতা কে জানে? কারণ সিঁড়ির মুখে দড়ি দিয়ে পথ বন্ধ করে লেখা আছে—'নো পাবলিক অ্যাকসেস'। অর্থাৎ উপরে যাওয়া সাধারণের জন্য বারণ।

তা যাই হোক নীচ থেকে বাড়ির স্থাপত্য দেখলে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। মাথার উপরে টিউডর স্টাইলের আর্চ। বিশাল মার্বেল পাথরের ফায়ারপ্লেস। পায়ের নীচে মেঝে সাদা-কালো মার্বেলের। উপরের দিকে বিশাল ওরিয়াল উইনডো। নীচের তলায় বেশ কয়েকটা সুন্দর পাথরের মূর্তি, ছবি।

তা নীচে দাঁড়িয়ে এসব দেখছি আর ভাবছি, এ বাড়ি নিয়ে ভূতের গল্প লিখলে খারাপ হত না। বাড়ির মধ্যে আলো-ছায়াতে মেশানো বেশ একটা ভূতুড়ে পরিবেশ, যেটা খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। ভূত বলে যদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব থেকে থাকে তো এখানেই থাকবে। এ বাড়ি নিয়ে বেশ একটা ভয়-শিহরনের অনুভূতি সহজেই তৈরি করা যায়।

শারদীয়াতে বেশ কয়েকটা পত্রিকায় ভূতের গল্প লিখব কথা দিয়েছি। কিন্তু মাথায় প্রায় কিছুই আসেনি। একদিন রাতে কবরখানা গিয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে এসেছি। সেদিন টিপটিপ করে বৃষ্টিও হচ্ছিল। ভূতুড়ে কোনো অভিজ্ঞতাই হয়নি। ঠান্ডা যাতে না লাগে, তাই মাথায় টুপি টেনে কবরখানার নিচু দেওয়াল পেরিয়ে বেরোচ্ছি, হঠাৎ কোত্থেকে একটা লোক মুখোমুখি এসে পড়ল। সৌজন্যমূলক ভাবে 'হ্যালো' বলতেই লোকটা দেখি হাউমাউ করে শুনশান রাস্তা ধরে ছুটে পালাল। নির্ঘাৎ বাড়িতে ফিরে লোকটা ভূত দেখেছিল, এসব লিখবে। এভাবেই ভূতের জনপ্রিয়তা বাড়ে। মাঝখান থেকে যেটুকু প্লটের দেখা মিলেছিল, মুহূর্তে উধাও।

তা এরকম আরও কয়েকটা জায়গায় গেছি। কিন্তু ভূতের দেখা বা প্লটের দেখা পাইনি।

তা সেদিন ওই বাড়ির একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে একটা ভূতের গল্পের প্লটের কথা ভাবছি, হঠাৎ দেখি আমার পাশে আরেকটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। বয়স হয়েছে। সত্তর কি আশি হবে।

ওয়েলেস অ্যাকসেন্টে বলে উঠল—আপনি ভারতীয়?

—হ্যাঁ,—বলতে লোকটা আমার পরিচয় জানতে চাইল। কথায় কথায় জানলাম লোকটার নাম রবার্ট। বিশেষ করে ভারতীয়দের ওর খুব পছন্দ। তার কারণ ভারতের মতো শান্তির দেশ নাকি আর হয় না। ওর এখানেই জন্ম, এখানেই সারাজীবন কাটিয়েছে। ওর নাতিরাও সবাই পোর্ট ট্যালবটের স্টিল প্ল্যান্টে কাজ করে।

আমি আমার পরিচয় দিলাম।

আমার পরিচয় পেয়ে লোকটা বলে উঠল—শুধু আমার ছেলে নয়, এখানে আমি যাদেরকে চিনি, সবার ভবিষ্যৎ—এখন তোমাদেরই হাতে। অনুরোধ করছি, দেখো যাতে এই প্ল্যান্ট বন্ধ না হয়।

এখানে বলে রাখি যারা ওই কোম্পানির বোর্ডে ছিল ও যাদের উপরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব ছিল, আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন।

জানালাম—সে চেষ্টাই করছি। তবে যেভাবে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে, তাতে কোনো সংস্থাই এ ধরনের ব্যবসায় থাকতে চাইবে না।

লোকটা জানি না কেন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করে উঠল—এ বাড়ির উপরতলায় যেতে চাও?

—হ্যাঁ, যেতে তো চাই, কিন্তু উপরে ওঠা তো বারণ।

লোকটা হেসে উঠে জামায় লাগানো একটা ব্যাজ দেখিয়ে বলে উঠল—আমি 'ফ্রেন্ডস অফ মারগাম পার্ক'-এর সদস্য। আমরা স্বেচ্ছায়, কোনো ধরনের পারিশ্রমিক ছাড়াই এই বাড়ি তোমাদের মতো টুরিস্টদের দেখাই আর এখানকার ইতিহাস শোনাই। আমার কাছে এ বাড়ির সব বন্ধ—নিষিদ্ধ ঘরগুলোর চাবি আছে।

—তা এ ঘরে যাওয়া নিষিদ্ধ কেন?

—সেকি! আসার আগে খবর নাওনি? এই ক্যাসলকে ব্রিটেনের সব থেকে বিপজ্জনক ভূতুড়ে বাড়ি বলা হয়। সারা পৃথিবী থেকে ঘোস্ট হান্টাররা এখানে আসে। 'ঘোস্ট হন্টেড হাউস'-এর উপরে যে ক'টা অনুষ্ঠান হয়, তার সবেতেই একদম উপরের দিকে এর স্থান। নানান ধরনের প্যারানরমাল অ্যাকটিভিটি এখানে হয়।

—তা আপনার কি মনে হয়? আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?

—না না, আমি ও সবে বিশ্বাস করি না।

—তাহলে উপরে ওঠা নিষিদ্ধ কেন?

—এমনিতে ওর বাইরে আরেকটা কারণও আছে। এসব ঘরগুলোতে অনেক বিরল প্রজাতির বাদুড় আছে। লোকজনের চলাচল হলে ওদের থাকার অসুবিধে হবে, সেইজন্য এরকম ব্যবস্থা। তা চল, তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

লোকটা এবারে সিঁড়ির পথে আটকানো দড়ি সরিয়ে আমাকে উপরে নিয়ে এল। পকেট থেকে চাবির গোছা বার করল। তালা খুলে একটা ঘরে ঢুকলাম। ঘরগুলো যে খুব অন্ধকার তা নয়। ধার দিয়ে কাচের আয়তাকার ওরিয়াল স্টাইলের জানলা। নীল রঙের দেওয়াল। তাতে কাঠের ফ্রেমে কিছু বিশাল বিশাল ছবি টাঙানো। ঘরের কিছু জায়গায় পাইন কাঠের ফ্লোরিং। কয়েকটা ঘরে ঝাড়লণ্ঠন আছে। আসবাব নেই বললেই চলে। গা-ছমছমে পরিবেশ। একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে আরেকটা ঘরে যাওয়া যাচ্ছে। মাঝে আর্চশেপের দরজা। ঘরের কোনো কোনো জায়গা বেশ অন্ধকার। জানলা দিয়ে আসা আলোয় বাইরের

মেঘের চঞ্চলতা ধরা পড়ছে। আলোছায়া তাই ঘরের মধ্যে যেন বারবার সরে সরে যাচ্ছে।

একটা ঘরের মধ্যে এসে লোকটা বলে উঠল—এই ঘরটাতে অনেকবার বাচ্চাদের কান্নার গলা শুনতে পাওয়া গেছে। দিনেরাতে হঠাৎ করে বাচ্চাদের ছোটাছুটির আওয়াজ পাওয়া যায়। কয়েকমাস আগে একটা পাঁচ বছরের বাচ্চার লুকিয়ে উপরে উঠে এসেছিল। প্রায় দু'ঘণ্টা বাদে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে পাওয়া যায়। নেমে বলেছিল যে সে নাকি আরেকটা বাচ্চার সঙ্গে উপরে খেলছিল।

—তাই? বাচ্চারা তো আর মিথ্যে কথা বলে না। তা আপনি নিজে কখনও শুনেছেন?

লোকটার ঠোঁটের কোণে শুধু হাসি ফুটে উঠল। বলে উঠল—বয়স হলে অনেক কিছু শোনা যায়। কোনটা কার বোঝা যায় না। তবে ওই বাচ্চা ভূতের থেকে অনেক বেশি দুর্নাম রবার্ট স্কটের ভূতের।

—সে কে?

—দেড়শো বছর আগে ট্যালবটরা যখন এখানে থাকত, তখন রবার্ট স্কট এখানকার গেমকিপার ছিল। অর্থাৎ স্কটের দায়িত্ব ছিল আশেপাশের জঙ্গল ও তার পশুপাখির খেয়াল রাখা যাতে অন্য কেউ অন্যায় ভাবে ঢুকে পশুপাখি শিকার না করে। একবার এক চোরা পাচারকারীকে সে ধরে ফেলে। কিন্তু ওই পাচারকারীর গুলিতেই স্কট মারা যায়। সেই থেকেই স্কটের অতৃপ্ত আত্মা এখানে থাকে। অনেক সময় তাকে দেখা গেছে। সে নাকি খুব রেগে থাকে। তেড়ে তেড়ে আসে। পাথর ছোঁড়ে। তবে গত দশ বছরে সব ধরনের সতর্কতা নেওয়ার পরে আর সেরকম ঘটনা বেশি ঘটেনি। উপরে তো আর কাউকে আসতে দেওয়া হয় না। তবে তা সত্ত্বেও অনেক সময় দোতলার ভেতরের বারান্দায় ছায়ার মধ্যে কাউকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

আমি লোকটার কথা শুনছিলাম আর ঘুরে ঘুরে ঘরের চারদিক দেখছিলাম। ঘরের অন্ধকার কোণগুলো ভালো করে না দেখা গেলেও ঘরের ছাদের কিছু কোণে যে বাদুড়ের দল আছে, সেটা বোঝা যাচ্ছিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে সব ঘর দেখানোর পর লোকটা বলে উঠল—তুমি খুব ভাগ্যবান। যে ঘরগুলো দেখলে তা দেখার জন্য বহু লোক বহু বছর ধরে অপেক্ষা

করে থাকে। তোমার উপরে আমার এই শহর, আমার বংশধরেরা আজ নির্ভর করে আছে। তাই দেখালাম। আজকে এই বাড়ির যে অবস্থা, কালকে আমাদের এই শহরের সে অবস্থা হতে চলেছে স্টিল প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে গেলে। ঘোস্ট টাউন। তুমি দেখ যদি কিছু করা যায়।

—অবশ্যই। সবরকম চেষ্টা করছি। দেখা যাক কি হয়। এ তো আর একার সিদ্ধান্ত নয়। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে একটা ছবি নিতে পারি? বলে ফোন বার করলাম।

লোকটা বলে উঠল—না, না, আমার ছবি তোলা উচিত হবে না। এসব জায়গা আমার দেখানোর কথা নয়। একেবারে নিষিদ্ধ। ছবি তোলার রিস্ক আমি নিতে চাই না।

কি আর করা যাবে। লোকটার সঙ্গে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। নীচে তখনও কেউ নেই।

ধন্যবাদ জানিয়ে বেরোনোর আগে ফের বলে উঠলাম—এ বাড়ির দায়িত্ব থেকেও আপনি যে বলতে পারেন, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন না, তা বলার জন্য সত্যিই অনেক সাহস লাগে।

লোকটা হেসে বলে উঠল—মানুষ দু'ধরনের হয় জানো তো? হয় সে ভূতে বিশ্বাস করে, না হলে সে নিজেই ভূত হয়। কি, কিছু বুঝলে? আসি।

—মানে?

লোকটা উত্তর না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আবার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। লোকটা তো আগে বলেছিল যে ও নাকি ভূতে বিশ্বাস করে না। তাহলে কি ওই!

আমি আর দাঁড়ালাম না। কখন আবার মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে দেখে কে জানে। ঘরগুলো ভালো করে দেখতে গিয়ে লোকটার মুখের দিকে খেয়াল করে তাকানোই হয়নি।

দ্রুত পায়ে ক্যাসেল থেকে বেরিয়ে এলাম। লোকটার নাম যেন কি বলেছিল? রবার্ট? পুরোটা কি তাহলে রবার্ট স্কট? বেরিয়ে খানিকটা এসে আবার ক্যাসলের দিকে ফিরে তাকালাম। বাইরের কাঠের দরজা বন্ধ। দূরে একটা নোটিস বোর্ড। আগে খেয়াল করিনি। সোমবার এ ক্যাসল বন্ধ থাকে। এখানে বলে রাখি, সেদিনটা সোমবারই ছিল।

পাথরের রাস্তায়

ট্রাফালগার স্কোয়ার। লন্ডনের প্রাণকেন্দ্র। প্রথমেই চোখে পড়ে নেলসন কলাম আর তার নীচের চারটে সিংহ। কিরকম নির্লিপ্ত দৃষ্টি। কিছুই যেন আসে যায় না। উদাসীন ভাবে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। আমার এখন ঠিক একইরকম অনুভূতির দরকার। ভিতরের কোনো অনুভূতি যেন মুখে প্রকাশ না পায়।

এতোদিনের ট্রেনিং। তবু মুখের পেশীগুলো মাঝে-মধ্যে শক্ত হয়ে যাচ্ছে বেশ বুঝতে পারছি। হাতের আঙুলগুলো কিরকম যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। তাই পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রেখেছি। আর বারবার হাত চলে যাচ্ছে ধাতব জিনিসটার উপরে। ওর উপস্থিতি বোঝার জন্য। বুকের ভেতরটা একই সঙ্গে কিরকম করে উঠছে। অনেকটা স্কাই ড্রাইভিং-এর অনুভূতি। জানি না কেন এরকম হয়। আমার তো এখন নিজের মৃত্যুভয়ও নেই, তবুও।

অক্টোবর মাস। এখনও শীত জাঁকিয়ে বসেনি। তবু মাঝে-মধ্যে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সারা শরীর তখন কেঁপে উঠছে। খানিক আগেও এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই বৃষ্টিভেজা রাস্তায় শীতের লাজুক রোদ পড়ে হীরের দ্যুতিতে চমক দিচ্ছে।

লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে একটা লোক ভূতের মুখোশ পরে বাতাসে ভাসছে। লোকটার চারদিক দিয়ে ঘুরে এলেও বোঝা যাচ্ছে না কিভাবে ও বাতাসে ভাসছে। ও একা নয়। সামনের বিশাল খোলা চত্বরে আরও দুজন একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ভিন্ন পোশাকে। একজন স্পাইডারম্যানের পোশাকে। অন্যজন একটা বিদঘুটে রুপোলি রঙের পোশাকে বন্দুক হাতে। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হয় যেন মূর্তি। এরা তিনজনই বাতাসে ভাসছে। সামনে দিয়ে কোনো বাচ্চা গেলে মাঝে-মধ্যে হঠাৎ করে ওরা নড়ে উঠে ভয় দেখাচ্ছে। কেউ বা ওদের সঙ্গে সেলফি তুলছে। তবে তেমন ভিড় হচ্ছে না।

এখানকার টুরিস্ট এরকম রোজ দেখে অভ্যস্ত। বাচ্চাদের যা একটু আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

সামনে একটা লোক গান চালিয়ে মাইকেল জ্যাকসনের মতো অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে। তাকে ঘিরে এতো ভিড় হয়েছে যে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন-দুজনকে ডেকে নিচ্ছে। তারাও লোকটার সঙ্গে নাচার চেষ্টা করছে।

শনিবার এখন দুপুর দুটো। বাতাসের ঠান্ডা খোঁচায় তবু কেন জানি সেই বারুদের গন্ধ। বারবার ভাবি যাকে পিছনে ফেলে এসেছি, সে ফের উঁকি মারে রং-করা চুলে লুকিয়ে থাকা পাকা চুলের মতো। ফিরে আসে আমার হারানো অতীত। ফিরে আসে জীবনের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন। তখন খুব রাগ হয়। ঘৃণা হয় সবার উপরে।

আমার বাবা ছিল, মা ছিল, বোন ছিল। অ্যালেপ্পো-তে বাড়ি ছিল। পাথর বাঁধানো রাস্তার পাশে ছোট একটা হলদে রঙের দোতলা বাড়ি। পাশ থেকে ভেসে আসত বেকারিতে তৈরি রুটির মিষ্টি গন্ধ। বাড়ির থেকে কিছু দূরেই ছিল চক বাজার। কয়েকশো বছরের পুরোনো সে বাজারে পাওয়া যেত না এমন কিছু নেই। সে বাজারে ঝলমল করত সিল্কের শাল আর নানান ধরনের গয়না।

ছিল উলের তৈরি নানান ধরনের কিলিম-এর দোকান। এসব কিলিম ঘর সাজানোর কাজে লাগে। বিদেশিরা এসে ভিড় করত এসব দোকানে পুরোনো কিলিম কিনতে। আমার মাও বাড়িতে এসব কিলিমের উপরে নানান ধরনের কাজ করত।

আমার বাবা কলেজে পড়াত। মাঝে-মধ্যে কবিতা লিখত। বাবা ছিল নিজার কাবানির কবিতার খুব ভক্ত। তবে নিজে যে খুব ভালো লিখত তা নয়। সবাইকে পড়ে শোনাতে খুব ভালোবাসত। নতুন কোনো কবিতা লিখলে আমাদেরকেই সবার আগে শুনতে হত।

আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা। তার উপরে নির্ভর করে বিজ্ঞান না সাহিত্য—কি বিষয় নিয়ে আরো পড়াশোনা করব সব ঠিক হবে। তাই খুব মন দিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। পড়াশোনায় ভালোই ছিলাম। বিশেষ করে অংকে আর বিজ্ঞানে। তাই ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার। ভবিষ্যতে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার কথা ভাবতাম।

কিন্তু সেদিন আর আসেনি। ফাইনাল পরীক্ষাও দিতে হয়নি।

তার আগেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। পাথরের রাস্তায় রক্তের দাগ পড়ল। পড়ানোর চাপের জন্য প্রথমে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতাম না। বাবাও খানিকটা আড়াল করে রেখেছিল বাইরের এই ধুলোয় ঢাকা পৃথিবীর থেকে। জিজ্ঞেস করলে বলত—ওসব যত জানবি, তত ঘৃণা করতে শিখবি। ধর কয়েকজন বাচ্চাকে কয়েকটা বেলুন দেওয়া হল। কয়েকজনেরটা লাল, অন্য কয়েকজনেরটা নীল। দেখা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের মধ্যে দুটো দল হয়ে যাবে। একদল লাল বেলুনের। অন্যদল নীল বেলুনের। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দেবে। এটা কেউ ভাববে না যে ওই বেলুনটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত ওরা সব একইরকম ছিল। আমরা পৃথিবীতে আসি ভালোবাসার জন্য। কিন্তু যতদিন যায়, আমরা জীবনকে নানান রঙে দেখতে শুরু করি। আর সে রঙের আড়ালে হারিয়ে যায় আসল মনুষ্যত্ব। ভালোবাসা সবাইকে সমান করে দেয়। কিছু লোক সেটাই চায় না।

বাবা না বললেও, বন্ধুদের কথাতে বুঝতাম একটা বড় ধরনের গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। আগে যাদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলতাম, যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, সবাই দেখলাম হঠাৎ করে যেন আলাদা আলাদা রঙের হয়ে গেল। এই বেলুনের মতোই। কিছুদিনের মধ্যে স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। বারণ হয়ে গেল রাস্তায় বেরোনো। এমন কি শুনলাম পাঁচজনের বেশি একসঙ্গে জমায়েত নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় সেনাবাহিনীর লোকেদের নিয়মিত নজরদারি শুরু হল।

খাবারের দাম হঠাৎ করে এতোটাই বেড়ে গেল যে আমাদের মতো পরিবারেও মেপে মেপে জিনিস কেনা শুরু হল। দুধ, রুটি, মাংস, ডিম ঠিক যেটুকু না খেলে চলে না, তাই কেনা হত। বাবার কলেজও বন্ধ হয়ে গেল। আমরা বাড়িতে তৈরি কিছু শাকসব্জি বিক্রি করতে শুরু করলাম। এন্ড গেমে আটকে থাকা দাবার বোর্ডের শেষ কয়েকটা বোড়ের মতো আমরা টিঁকে ছিলাম। ভেবেছিলাম যুদ্ধ শেষ অব্দি এভাবেই বেঁচে থাকতে পারব। ভুল ভেবেছিলাম।

গুলি আর বোমার আওয়াজ যেন আরও এগিয়ে এলো। মনে হল যেন প্রত্যেকটা দিন আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। রক্তের দাগ যেন আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

আকাশে পাখির ঝাঁকের মতো উড়ে আসতে শুরু করল বোমারু বিমান। আমরা তখন দিশেহারার মতো ছুটে এসে নীচের ঘরে আশ্রয় নিতাম।

তারপরে এলো সেদিন। দুপুরবেলা হঠাৎ কানে তালা লাগানো বোমা পড়ার আওয়াজ। একটা যেন খুব কাছে এসে পড়ল। একই সঙ্গে হাজারটা পাথরের ছোট ছোট টুকরো যেন গায়ে এসে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণা।

জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান যখন ফিরল, দেখি আমি হাসপাতালে। সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। ভয়ে বিস্ময়ে খেয়াল করলাম আমার বাঁ হাত নেই। কনুই-এর নিচ থেকে নেই। শুনলাম পাথরের তলা থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমার বাঁ হাত কেটে ফেলতে হয়েছে।

সেই প্রথম শুনলাম আমি একা। আর কেউ বাঁচেনি। মা, বাবা, বোন—আমার আপনার বলতে আর কেউ নেই। আর কেউ নেই। পড়ে আছে শুধু পাথরের রাস্তা।

সেদিন থেকেই আমি মানুষকে ঘৃণা করতে শিখলাম। এতোটা ঘৃণা যে হাসতে গেলেও অভিনয় করতে হত। চোখের আগুন লুকিয়ে রাখতে হত রোদচশমার আড়ালে। অজান্তে আমার মনেও রঙের বিষ ছড়িয়েছিল। সবই তাতে কালো দেখায়। সবাইকে তাতে শত্রু মনে হয়।

যাক গে সে কথা। ন্যাশনাল গ্যালারির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম। বিশাল বিশাল স্তম্ভ। ঢোকার মুখে একটা বড় চাতাল। সেখানে দাঁড়ালে পুরো ট্রাফালগার স্কোয়ার দেখা যায়।

ঠিক তিনটের সময় আজ এখানে আর্ট গ্যালারির গেটের গার্ড বদলাবে। আসবে নতুন গার্ড। এখন তারই জন্য অপেক্ষা। আমার হাতে একটা কোকের বোতল। পরনে জিন্সের উপরে ঢোলা টিশার্ট। তার উপরে ফুলহাতা জ্যাকেট।

একদল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী আসছে। মনে হয় জুনিয়র স্কুলের। ক্লাস ফাইভ বা সিক্সের হবে। আর্ট গ্যালারি দেখে ওদের কি আর ভালো লাগবে? কি জানি?

অবশ্য যে দেশে মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের ব্যবধান মুহূর্তের নয়, সেখানে বোধহয় এরকমই হয়। সেখানে জীবনের স্বপ্ন ছবির রঙে মিশে যায়।

মনে আছে আমার বোনও ছবি আঁকতে খুব ভালেবাসত। সময় পেলেই রঙপেন্সিল আর তুলির দাগে কাগজ ভরিয়ে দিত। স্কুলে বেশ কিছু প্রাইজও পেয়েছিল ছবি এঁকে। বাবা বলত ওকে ভালো আর্ট অ্যাকাডেমিতে পাঠাবে। কিন্তু তারপর যে কি হল!

আজও মনে আছে সেদিনটার কথা, যেদিন বাড়ি ফিরে গেলাম হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে। দেখি আমাদের পুরো পাড়া জুড়ে যেন ভূমিকম্পের তাণ্ডব। গোলাগুলি আর অবিরাম বোমা বর্ষণে বাড়িগুলো দেশলাইয়ের বাক্সের মতো ভেঙে গিয়েছে। শুধু নীচের দিকের কিছু ইট-পাথরের কঙ্কাল টিঁকে আছে। সামনের পাথরের রাস্তা জুড়েও নানান ক্ষতচিহ্ন।

সেদিনও রাস্তায় দেখেছিলাম ট্যাঙ্ক। আস্তে আস্তে সরু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। প্রথম টের পেয়েছিলাম ঘৃণা শব্দটার আসল অর্থ। একটা ছোট চোরা গলি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছিলাম একটা পাথরের টুকরো নিয়ে। কে যেন আমার ডান হাত টেনে ধরল। আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তার পরে সরিয়ে নিল আরেকটা ভাঙা বাড়ির মধ্যে। তারও হাতে বন্দুক ছিল। সেদিনই বুঝেছিলাম এ যুদ্ধে কেউ কোনোদিন জিতবে না। যে যুদ্ধে সবার হাতে বন্দুক, সে যুদ্ধ কখনও শেষ হয় না।

তিনটে বাজতে আর ঠিক পাঁচ মিনিট। এখনও লাইন করে স্কুলের ছেলেমেয়েরা ভেতরে ঢুকছে।

আর সময় পেল না আসার? আজকেই এখনই আসতে হল? তাও আবার একসঙ্গে শদেড়েক ছাত্রছাত্রী। ওদের সঙ্গে দুজন টিচার আছে। আর একজনও সঙ্গে আছে। তার বয়স ষাটের উপরে হবে। সেই বোধহয় এ ইভেন্টের মূল উদ্যোক্তা। হুইল চেয়ারে বসে। মনে হল লোকটার সেরিব্রাল পালসি আছে। স্টিফেন হকিং-এর মতো। হুইল চেয়ারের জন্য যে পথ রাখা আছে তা দিয়ে লোকটা উঠে আসছিল। আমি এগিয়ে গেলাম সাহায্য করতে। ঠেলে নিয়ে এলাম গেটের কাছাকাছি।

আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লোকটা আমার দিকে তাকাল। এতো গভীর দৃষ্টি আমি আগে কখনও দেখিনি। ও কি কিছু বুঝতে পেরেছিল? আমার চোখে ও কি হিংসার আগুন দেখেছিল?

শুধু আমাকে ডেকে একটা কার্ড দিয়ে বলে উঠল—ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে কাজ করো। তোমার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।

কার্ডটা দেখলাম একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যারা উদ্বাস্তু বাচ্চাদের আর শরণার্থীদের নিয়ে কাজ করে। আর তার উপরে লেখা 'Have a purpose for your life'. জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে বার করো।

আশ্চর্য, আমার বাবা ঠিক এই কথাটাই বারবার বলত। ঠিক হুবহু এই একই কথা। আজকের এই মুহূর্তে এই একটা কথাই কি আমার এতোদিনের ট্রেনিংকে ব্যর্থ করে দিল! চোখের কোণে জল চলে এসেছিল। সে চোখের জল লুকিয়ে আবার আগের জায়গায় চলে এলাম।

এই জীবনের উদ্দেশ্যটাই তো হারিয়ে ফেলেছি। সিরিয়া থেকে তুর্কিস্থান, সেখান থেকে গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্স হয়ে ইংল্যান্ড। শুধু একটাই পরিচয় পেয়েছি। 'অ্যাসাইলাম সিকার'। শরণার্থী। কিছু অন্ন-বাসস্থানের জন্য দেশে দেশে ভিক্ষা করে বেড়াই। আর এই দুরূহ পথে অনেক কিছুই হারাই। সবার আগে হারাই আত্মমর্যাদা বোধ, যা ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে তফাৎটুকু বুঝতে দেয় না। বুঝতে পারি না কাকে আমার দেশ বলব। কাকে আমার আপনার ভাবব। মনে হয় আমি যেন ঝড়ে উড়ে যাওয়া ছোট এক পাতা। সম্পর্কহীন।

পকেটের ফোনটা কাঁপছে। দেখার দরকার নেই। বুঝতে পারছি কি মেসেজ এসেছে। গেটের সামনে আজহার এসে গেছে। ফর্সা, লম্বা, রোগা চেহারা। চোখে রিমলেস চশমা। কেউ ভাবতে পারে না ও টেররিস্ট। কিন্তু একশোটা খুন করতেও ওর হাত কাঁপে না।

বাইরে যে তিনটি লোক বাতাসে ভাসছিল, ম্যাজিক দেখাচ্ছিল, এখন তারা থেমে গেছে। ওদেরও দৃষ্টি এখন এই দিকেই। শুধু সেকেন্ডে সময় গোনা। আর খানিকক্ষণের মধ্যেই সব চ্যানেলের ব্রেকিং নিউজ একটাই হতে চলেছে।

প্ল্যানমাফিক আজহার ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির ভেতরে চলে যাবে। আর ভেতর থেকে ওর কাজ শুরু করবে। হঠাৎ করে গ্যালারির দর্শকদের উপরে গুলি ছুড়তে শুরু করবে। কোথা থেকে শুরু করবে, কোন ঘর থেকে কোন ঘরে যাবে, সবই নিখুঁত ভাবে প্ল্যান করা হয়েছে। আমি থাকব বাইরের দরজার কাছে। যে পালিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইবে, সেই হবে আমার শিকার। আমার সঙ্গে যোগ দেবে ওই তিনজন। আঘাত হানব সভ্যতার মূল গর্বের জায়গায়।

আমার দিকে একঝলক তাকিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডের দিকে এগিয়ে গেল আজহার। নতুন গার্ড বিদায়ী গার্ডের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করে বাকি কয়েক ঘণ্টার দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছে। এটাই সিকিউরিটির একটা দুর্বল মুহূর্ত, যার ফাঁকে কেউ ভিতরে বন্দুক নিয়ে ঢুকে পড়তে পারে। আমার এখন কাজ হবে কোকের বোতল নিয়ে ঢোকা যাবে কিনা সে প্রশ্ন করে আরও ওদের অন্যমনস্ক করে দেওয়া। আমি একটু এগিয়ে এলাম।

কিন্তু না, এখন আমি আর ওদের দলে নেই।

ডান হাত দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে জ্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ধাতব যন্ত্রটাকে বার করলাম। গুলি করলাম অব্যর্থ লক্ষ্যে। আশেপাশের লোকেরা হয়তো সে গুলির শব্দ পেয়েছিল। আমি পাইনি। দরজার কাছে লুটিয়ে পড়েছে আজহার। সবাই আমার দিকে ঘুরে তাকাচ্ছে। সিকিউরিটির উদ্যত বন্দুক এখন আমার দিকে তাক করা। ওরা বুঝতে পারেনি কি হতে চলেছিল। আর কেনই বা আমি ওকে গুলি করলাম। হঠাৎ কয়েকটা গুলি আমার পিঠে এসে লাগল। পড়ে গেলাম।

মুহূর্তে চোখের সামনে ফিরে এলো আমার সেই শহর। আমার সেই বাড়ি। ঐ তো বসার ঘরের কার্পেটে বাবা বসে আছে। সামনে লেখার খাতা। আজকেও নিশ্চয়ই আবার বাবা পড়ে শোনাবে ওর লেখা নতুন আরেকটা কবিতা। ওই তো আমার সামনেই বোনের আঁকায় ভরে ওঠা শোয়ার ঘরের দেওয়াল।

ওই তো বাবার মুখে আজ ফের নিজার কাবানি। চোখে জল। রুদ্ধ গলায় বলে উঠছে—আজ আমাদের চিৎকার আমাদের কাজের থেকে বড়, আজকে আমাদের তরবারি আমাদের থেকেও বড়। এটা দুঃখের, বড় দুঃখের। পোশাক আমাদের সভ্যতার, আর হৃদয় আমাদের প্রস্তরযুগের।

আমি এখনও কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। শুধু দেখতে পাচ্ছি পাথরের রাস্তায় এগিয়ে আসছে ট্যাঙ্ক। পাখির ঝাঁকের মতো উড়ে আসছে বোমারু বিমান।

না, আমি আর তা হতে দেবো না। ওই—ওই তো আমার বোন, ওই তো আমার মা। আমি আর তাদের হারিয়ে যেতে দেবো না। এ পৃথিবী রক্ষার দায়িত্ব আমারই।

আগে কোথায় দেখেছি?

গরম চায়ে সবে একটা চুমুক দিয়েছি, হঠাৎ দেখি দোকানের ভেতর থেকে একটা লোক প্রায় ছুটে বেরিয়ে আসছে। আমার কাছে এসে উত্তেজিতভাবে বলে উঠল—নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। শেষে যে আপনার দেখা পেলাম, আপনি আমার দোকানে এসেছেন, এ যে কত বড় আনন্দ, তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি কিন্তু আপনার কাছ থেকে কোনোকিছুর দাম নিতে পারব না। আগেই বলে দিলাম।

কি বলব বুঝে উঠতে পারলাম না। লোকটাকে আগে কোনোদিন দেখিনি। সেরকম কোনো কেউকেটা লোক নই যে আমাকে কেউ রাস্তায় দেখে আনন্দে আটখানা হবে। হঠাৎ করে এসব বলার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?

লোকটা কি আমাকে নিয়ে মজা করছে? লোকটার মুখ দেখে মজা করছে বলে মনে হয় না। আমাকে দেখে বিনা কারণে এরকম মজা করবেই বা কেন?

লোকটা আমাকে দেখে তখনও রীতিমতো উত্তেজিত।

—তুমি বোধ হয় কারুর সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলছ। আমি সামান্য চাকরিজীবী। অভিনেতা কৌশিক বাগচির সঙ্গে আমার একটু মিল আছে বটে, কিন্তু আমি অভিনয়ের ধারকাছ দিয়ে যাই না।

লোকটা একটু হাসল। বলে উঠল—না না, আমি কারুর সঙ্গে আপনাকে গুলিয়ে ফেলিনি। আপনাকে আমি ভালো করেই চিনি। আপনি ভালো করে বসে চা খান। আমি একটু বাদেই বেরিয়ে এসে বলছি। আপনি কিন্তু আমার সঙ্গে কথা না বলে যাবেন না।—বলে একটু থেমে লোকটা ফের বলে উঠল—আমার দোকানের মাছের কচুরি খেয়ে দেখুন। খুব ভালো।

—না, ভাই। আর কিছু খাব না। শুধু চা।

—না না, এতো সহজে না খাইয়ে ছাড়ি! এতোদিন বাদে দেখা। খেতেই হবে।—লোকটা বেশ একটু জোর দিয়ে বলে উঠল—ভোলা, দাদার জন্য তিনটি স্পেশাল মাছের কচুরি। দাঁড়া, তোর দ্বারা হবে না। আমিই দাদারটা করছি।

—ওরে বাবা, একেবারে তিনটে! একটাই পারব না খেতে।

—আপনাকে সামনে পেয়েছি। এতো বছর বাদে। আর আমার দোকানে মাছের কচুরি যারা খায়, একটা খেয়ে আরেকটা চায়। খেয়েই দেখুন না।

চুপ করে গেলাম। কিছু একটা বড় ভুল হচ্ছে বেশ বুঝতে পারছি। শেষে লজ্জায় পড়ে যেতে হবে। আমাকে ঘিরে চারদিকে এই বাড়তি মনোযোগে একটু অস্বস্তি অনুভব করছিলাম।

কলকাতা থেকে বকখালি বেড়াতে এসেছি। বিচের কাছে একটা ছোট চা-তেলেভাজার দোকান। দেখে মনে হয় ভালোই চলে। সামনে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে চেয়ার-টেবিল পাতা। তারই একটাতে বসে আছি। এখন সকাল দশটা। বেশ ভিড়।

হোটেলে স্ত্রী-পুত্রকে রেখে বিচের ধারে বেড়াতে এসেছিলাম। ফেরার পথে দোকানে চা খেতে গিয়ে এই কাণ্ড। এখানে হঠাৎ করে এরকম একজন সম্পূর্ণ অচেনা একটা লোক আমাকে ভালো করে জানে বলে দাবি করবে, আমাকে নিয়ে এতোটা উৎসাহ দেখাবে, এরকম আশা করিনি।

লোকটা দোকানে ফিরে গেছে। দূর থেকে খানিকক্ষণ লোকটার দিকে খেয়াল করে তাকালাম। বয়স তিরিশের কাছাকাছি হবে। চওড়া ভুরু। চোখের নীচটা একটু বসা। গোঁফ নেই। মুখের মধ্যে কিরকম যেন একরোখা ভাব আছে। ছোটখাটো রোগা ছিপছিপে চেহারা। পরনের হাফহাতা সবুজ টিশার্ট। তার উপরে আবোল-তাবোল অনেক কিছু লেখা।

নাহ, শিওর, একে কখনও দেখিনি। আমার স্মৃতি অতটা খারাপ নয়। কলকাতার একটা নামী ইউনিভার্সিটিতে গত পনেরো বছর ফিজিক্স পড়াই। আমার স্টুডেন্ট হবে, এরকম কোনও সম্ভাবনা নেই। খুব বেশি মেলামেশা করি না। তাই যাদের সঙ্গে মিশি, তাদের প্রত্যেকের কথা মোটামুটি খেয়াল থাকে।

দোকানে বেশ কয়েকজন কর্মচারী আছে। যে লোকটা বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলছিল, সেই যে মালিক তাতে সন্দেহ নেই। কে হতে পারে চা খেতে খেতে সেকথা ভাবছি, ইতিমধ্যে প্লেটে বেশ কয়েকটা কচুরি নিয়ে লোকটা দোকান থেকে বেরিয়ে এলো।

একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসে বলল—এখনও চিনতে পারেননি তো?

—না ভাই, কোথায় দেখেছ বলো তো? আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না। তুমি নির্ঘাত কোথাও ভুল করছ। আমার নাম জানো তুমি?

—না, আপনার নাম জানি না। তবে আমার চিনতে ভুল হয়নি। আপনার জন্যই তো আমার জীবনটা হঠাৎ করে সেদিন পাল্টে গেল। সে কি আর আমি ভুলতে পারি!

একটু থেমে ফের বলে উঠল—আপনি বোধহয় দোকানের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটা খেয়াল করেননি। একটু দেখে আসুন।

চেয়ার ছেড়ে দোকানের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাঁদিকের দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো আছে। কাছে গিয়ে ছবি দেখে চমকে উঠলাম। এ তো আমারই ছবি। আমার কলেজজীবনের ছবি। বড় করে টাঙানো। এ ছবি কোথায় পেল ও?

লোকটা দেখলাম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—মনে পড়ে একদিন আপনি এক পকেটমারকে বাঁচাতে গিয়ে মার খেয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, সে তো বহু বছর আগের ঘটনা। বাসে করে কলেজে যাচ্ছিলাম। আমার পকেটমার হয়। আমার মানিব্যাগ নিয়ে পালাচ্ছিল। বাচ্চা ছেলে। আমি ধরে ফেলি। তারপরে বাস দাঁড় করিয়ে সব প্যাসেঞ্জার মিলে তাকে পেটাতে শুরু করে। আমি নিজে তখন ওই বাচ্চা ছেলেটার উপর ওরকম অমানবিক মারধর দেখে তাকে বাঁচাতে গিয়ে উল্টে মার খাই। সবাই ভেবেছিল আমিও বোধহয় ওর দলের লোক। আমারই যে মানিব্যাগ চুরি হয়েছে তা বলা বা বোঝানোরও উপায় ছিল না। যেরকম হয় আর কি। জনরোষ। ওই বাসে পকেটমার হওয়ার ঘটনা সেসময় বেড়ে গিয়েছিল। তাই সবার রাগ এসে পড়েছিল ওই

ছেলেটার উপরে। যে ছেলেটা চুরি করেছিল, তার বয়স তখন আর কত হবে। বারো বা তেরো। আমি ওকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছি দেখে, সবাই ভেবেছিল আমিও ওর সঙ্গে ওই কাজে যুক্ত।

—ঠিক বলেছেন। আর সে ছেলেটাই হলাম আমি। অনেক বছর কেটে গেছে। কিন্তু সেদিন আমি প্রথম একজন মানুষ দেখেছিলাম, যে ক্ষমা করতে জানে। একজন অচেনা ছেলেকে বাঁচাতে কোনো দ্বিধা না করে এগিয়ে যায়।

জানেন তো দাদা, সেদিনই প্রথম অপরাধ করে লজ্জা পেয়েছিলাম। ফিরে গিয়ে আমার কেন জানি না খুব খারাপ লাগে। মন খুব খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় আপনার মতো মানুষ হতে হবে। আর চেষ্টা করলে আমিও সেরকম হতে পারব। আস্তে আস্তে ওই দল ছেড়ে বেরিয়ে আসি।

অভাবের সংসার। পেটের দায়ে আর খানিকটা বাজে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ওসব কাজে হাত পাকিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিনের পরে সব পাল্টে যায়। ভাবি এমন কিছু করব যাতে মাথা উচু করে বাঁচতে পারি।

বাড়ি ফিরে আসি। আস্তে আস্তে এ দোকান চালু করি। অনেকদিন হয়ে গেল। এখন ভালোই দাঁড়িয়ে গেছে। দিব্যি চলে যাচ্ছে।

—তুমি এখনও আমাকে মনে রেখেছ? এত বছর পরে?

—ভুলব কি করে? মানিব্যাগটা তো আমার কাছেই রয়ে গিয়েছিল। আর তার মধ্যে আপনার একটা ছবিও ছিল, যা বড় করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিলাম। তাই আপনাকে রোজ দেখি। রোজ আপনার কথা ভাবি।

বলে লোকটা ফের দোকানের ভেতরে চলে গেল। আর খানিক বাদে আমার অনেক পুরোনো সেই মানিব্যাগটা নিয়ে ফিরে এলো, সেদিন যেটা চুরি হয়েছিল।

এনে আমাকে দেখিয়ে বলল—আমার কাছেই রেখে দিই এটা সব সময়। পাঁচ টাকা ছিল, আপনার একটা ছবি ছিল। এই যে সেই টাকা।

একটা পুরোনো দিনের পাঁচ টাকার নোট ব্যাগ থেকে বার করল লোকটা। এখন এ টাকা উঠেই গেছে। কবেকার কথা।

একটু থেমে বলে উঠল—আমি কিন্তু এ মানিব্যাগটা আপনাকে ফেরত দেবো না। এটাই এখনও আমাকে বারবার তখনকার কথা মনে পড়ায়। মনে হয় ওই দিনটায় ধরা না পড়লে কি হত আমার। আজও হয়তো ওই লাইনেই কাজ করতাম। সেদিন নির্ঘাত আপনাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, আমার জন্যে। কত মার খেয়েছিলেন। তারপরে টাকা না থাকায় অনেক অসুবিধে হয়েছিল নিশ্চয়। আমার তো ওরকম মার খাওয়ার অভ্যেস ছিল। আপনার তো আর তা ছিল না। আপনাকে ধরে ওরা যখন বেদম মারছিল, তখন তার মধ্যে আমি কোনোক্রমে পালাই।

আমি হাসলাম। বলে উঠলাম—সেদিন যখন ওই মারধোর খাওয়ার পরে ছাড়া পেলাম, তখন সত্যিই আমার খুব বাজে অবস্থা। জামাকাপড় সব ছিঁড়ে গেছে। টাকা নেই। মার খেয়ে ঠোঁট থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল। মুখ ফুলে গিয়েছিল। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা।

আমাকে ওখান থেকে এক ভদ্রলোক উদ্ধার করেন। পাশ দিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে কোথাও একটা ওরা ভুল করেছে। সেদিন গাড়ি করে উনি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেন।—একটু থেমে ফের বলে উঠলাম—আমার স্ত্রী ওনারই বড় কন্যা। সেদিনের ঘটনাটা না ঘটলে হয়তো আমার সঙ্গে ওর কোনোদিন আলাপ হত না। সেদিক দিয়ে ওই দিনটা আমার জীবনে একটা খুব ভালো দিন।

—এ তো দারুণ ব্যাপার দাদা। আজকে রাতে কিন্তু আপনাকে বৌদিকে নিয়ে একবার পদধূলি দিতেই হবে।

—কিন্তু ভাই, এভাবে দাম না দিয়ে তো আমি বিনা পয়সায় খেয়ে যেতে পারি না।

—দাম দেওয়ার মতো অবস্থায় থাকলে তো দেবেন। টাকা আছে আপনার কাছে?

—মানে?

পকেট হাতড়ে অবাক হলাম। মানিব্যাগ নেই। কোথায় গেল?

লোকটা হাসতে হাসতে ওর পকেট থেকে আমার মানিব্যাগটা বার করে এগিয়ে দিল—এবারের মানিব্যাগটা না হয় ফেরতই দিলাম। কিন্তু দাম দিতে চাইলে আর ফেরত দেবো না।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

কিছু দূরে কয়েকটা বাচ্চা মিলে বালি দিয়ে বিচের উপরে একটা ক্যাসেল তৈরি করছে। চারধারের এই ক্ষণস্থায়ী বালির মধ্যেও কিছু দাগ হয়তো থেকে যায়।

উলূপী

—খবরটা দেখেছিস? কি কাণ্ড।—বলে শৈবাল কাগজটা এগিয়ে দিল। একটা জনপ্রিয় সৈনিকের তৃতীয় পাতার নীচের দিকে একটা খবরে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

কি খবর দেখি?—দেবসেনাপতি খবরটা একবার ঝুঁকে দেখল। কিন্তু সেরকম কোনো আকর্ষণীয় কিছু দেখতে না পেয়ে বেজার মুখে বলে উঠল—অতো পড়তে পারব না। তুইই বলে দে না।

বলা বাহুল্য আজকের দিনটা হল শনিবার। আমরা সবাই শনিবারের বিকেলে আবার প্রতীকদের উত্তর কলকাতার বাড়িতে জড়ো হয়েছি। আজকে অনিলিখাদি ও বিশ্বজিৎদাও আমাদের সঙ্গে আছে। রীতিমতো অঘটনই বলা চলে। এদের দুজনকে একসঙ্গে শনিবারের আসরে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার।

সামনেই পুজো। দুপুরের দিকে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তার কোথাও কোথাও একটু জলও জমেছে। এখন গরম তেমন না থাকলেও বাইরে খানিকটা গুমোট হয়ে আছে। কার কি পুজোর প্ল্যান, কে কোথায় বেড়াতে যাবো—এসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

এসব কথার মধ্যেই হঠাৎ শৈবাল এ খবরের কথাটা বলে উঠেছিল।

দেব সেনাপতির কথায় উৎসাহ পেয়ে শৈবাল ফের বলতে শুরু করল—খবরটা হল, সুদানে লাটুকা উপজাতির লোকেরা নাকি বিয়ের সময় পাত্রীকে অপহরণ করে। মানে বাড়ি থেকে জোর করে তুলে আনে। তারপর ওই ছেলের বাড়ির থেকে কোনো এক গুরুজন মেয়ের বাবার কাছে নিয়ে এরজন্য বিয়ের অনুমতি চায়। মেয়ের বাবা যদি সম্মতি দেয়, তাহলে তার প্রমাণস্বরূপ যাকে পাঠানো হয়েছে, তাকে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হয়। আর মেয়ের বাবা যদি অসম্মতি জানায়, তাহলে আর সেক্ষেত্রে ছেলের বাড়ির লোককে মারা হয় না।

তবে মেয়ের বাবার অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও সে ছেলে কিন্তু ইচ্ছে করলে জোর করে ওই মেয়েকে তার পরেও বিয়ে করতে পারে।

—বাহ, এ তো বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।—একটু নড়েচড়ে বসল বিশ্বজিৎদা—তা হঠাৎ করে এরকম কথা বললি কেন রে শৈবাল? তুই আবার এরকম কোনো মেয়ে অপহরণ জাতীয় কিছু করিসনি তো? সেক্ষেত্রে অনিলিখাকে দূত হিসেবে মেয়ের বাড়ি পাঠাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কি বল অনিলিখা?

অনিলিখা আজ বেশ সেজেগুজে এসেছে। পুজোর সময় কলকাতায় থাকবে না। তাই মনে হয় পুজোর পোশাক আগেই পরে ফেলেছে। একটা নীল সালোয়ার কামিজ। চুলে একটা ঝিনুকের ক্লিপ।

অনিলিখাকে মুচকি হাসতে দেখে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল—তা খবরটা জানা ছিল তোমার?

—না, এ ব্যাপারটা ঠিক জানা ছিল না। তবে এরকম অনেক আজব অভ্যোস অনেক উপজাতির মধ্যেই থাকে। আমাদের ভারতেই এরকম কত উপজাতি আছে। চাকমা, গারো, কুকী, বোরো, চিরু, ভিল কত যে আছে। আমরা তাদেরই খবর রাখি না। আর প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু রীতিনীতি থাকে। একবার এরকম এক উপজাতিকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল।

—তার মানে তোমার ঝুলিতে এ ব্যাপারে কোনো গল্প আছে, তাই তো?

—হ্যাঁ, সেরকম একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার। তবে বহু বছর আগের ঘটনা।

—সেকি? এতদিন বলোনি তো—আমরা সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম।

অনিলিখা ফের মুচকি হাসল। ব্যাগ থেকে লাল লিপস্টিক বার করে ঠোঁটে একবার বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল—সবই যদি একদিনে বলে ফেলতাম, তাহলে কি আর আজকে এমন সুন্দর ঘুগনি খেতে পারতাম!

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, দরজা দিয়ে কাজের মাসি বেশ বড় একটা প্লেট নিয়ে ঢুকেছে। তাতে ঘুগনি, ঝুরিভাজা। অনিলিখা আর বিশ্বজিৎদা এই দুই বিশেষ অতিথির জন্যই যে আজকে এই ঘুগনির বিশেষ আয়োজন তা বলাই বাহুল্য। আমাদেরও সেই সুযোগে বেশ জমাটি সান্ধ্যভোজন হবে।

ঘুগনি অধ্যায় শেষ হতে মিনিট পনেরো লাগল। ইতিমধ্যে মাসিমা মানে প্রতীকের মাও গল্পের গন্ধে গন্ধে চলে এসেছেন।

অনিলিখা এবারে ধীরেসুস্থে বলতে শুরু করল—এটা বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তখন ইউনিভার্সিটিতে ছুটি পেলে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রতিবারই কোনো না কোনো পাহাড়ে ট্রেকিং করতে বেরিয়ে পড়তাম।

তা সেবারে গিয়েছিলাম হর কি দুন। তোদের মনে আছে কিনা জানি না, মহাভারত অনুযায়ী এই পথেই পাণ্ডবরা স্বর্গে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। এখান থেকে বেশ কয়েকটা পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়, যার মধ্যে ওই স্বর্গারোহিণী ১, ২, ৩ নামের তিনটে পাহাড় চূড়াও পড়ে।

পুজোর ঠিক আগে গিয়েছিলাম। ট্রেনে দিল্লি। সেখান থেকে বাসে দেরাদুন। দেরাদুনে পৌঁছে রীতিমতো বিপদে পড়ে গেলাম। কয়েকদিন ধরে ওখানে ভারী অকালবর্ষণ শুরু হয়েছে। শুনলাম পাহাড়ে নানান জায়গায় ধস নেমেছে। প্রাইভেট গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। একমাত্র ভরসা বাস।

আমাদের দেরাদুন থেকে সাকরি যেতে হত। সেখানে দিনে দুটো বাস যায়। শুনলাম এখন শুধু একটাই বাস যাচ্ছে।

যাই হোক, অতদূর গিয়ে তো আর ফিরে আসা যায় না। আমার সঙ্গে আমার কলেজের আরও দুজন বন্ধু ছিল। মিলন আর ধৃতিমান। আমরা ঠিক করলাম একটু অসুবিধে হলেও যে করেই হোক যাব। একদিন অপেক্ষা করে পরের দিন সকালে দেরাদুন থেকে সাকরির বাস ধরলাম। অনেকটা পথ। প্রায় দশ ঘণ্টার। যে সময়ের কথা বলছি, তখন এ পথে প্রায়ই দুর্ঘটনা হত। এখন জানি না কি অবস্থা। বাসে উঠে খেয়াল করলাম, আমাদের সঙ্গে যারা যাচ্ছে, তারা সবাই স্থানীয় বাসিন্দা। আমরা ছাড়া ট্রেকিং-এর উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, এরকম অন্য কাউকে চোখে পড়ল না। বুঝলাম ট্রেকিং করতে যারা এসেছিল, তাদের একটা বড় অংশ আশা ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেছে। ভেবেছিলাম সন্ধে আটটার মধ্যে সাকরি পৌঁছে যাব। কিন্তু বিধি বাম। ছটা নাগাদ মাঝপথে হঠাৎ বাস দাঁড়িয়ে গেল। নো নড়ন-চড়ন। কয়েকজন বাস থেকে নেমে এগিয়ে দেখতে গেল। আমরা বাসে বসেই অপেক্ষা করতে থাকলাম। এভাবে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। খানিকক্ষণ বাদে বাসের ড্রাইভার এসে জানাল, বাস আর যেতে পারবে না। সামনের রাস্তা ধসে বন্ধ হয়ে গেছে।

বাস থেকে নেমে পড়লাম। সরু রাস্তা। ২০০ মিটার মতো দূরত্বে একটা বড় ধস নেমেছে। রাস্তা বলে আর কিছু নেই। হয় বাসেই সারা রাত অপেক্ষা করতে হবে, না হলে আশেপাশে কোনো গ্রাম আছে কিনা খোঁজ নিতে হবে। এমনিতেও বাসে বেশি প্যাসেঞ্জার ছিল না। বেশিরভাগ আগেই নেমে গেছে। এখনও সাকরি প্রায় কুড়ি কিলোমিটারের রাস্তা। সারা রাত তো এখানে এরকম ভাবে বাসে বসে থাকা যাবে না। কি করব তা ভাবছি। এর মধ্যে একজন স্থানীয় বৃদ্ধ লোক জানাল, যে কাছেই চার কিলোমিটার দূরে একটু অন্য দিকে একটা খুব ছোট গ্রাম আছে। সে সেখানেই থাকে। আমরা যদি চাই ওর সঙ্গে যেতে পারি। রাতে একটা মাথা গোঁজার মতো জায়গা পেয়ে যাব।

উপায় ছিল না। ওই অচেনা লোকটার সঙ্গে এগোলাম। একটু অন্য দিকে। আরও প্রত্যন্ত গ্রাম। গ্রাম বলাটাও ঠিক কিনা জানি না। সামান্য কয়েক ঘর লোকের বাস। নাম জিজ্ঞেস করলাম। লোকটা প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে বলে উঠল—না, এ গ্রামের কোনো নাম নেই। অনেকে জানেই না যে এখানে কিছু লোক বাস করে।

ওই লোকটা আমাদের গ্রামের মোড়লের বাড়ি নিয়ে গেল। তখন সন্ধে হয়ে এসেছিল। আমাদের সঙ্গে তাঁবু, রুকস্যাক আছে। কোনো বাড়িতে থাকার জায়গা না পাওয়া গেলে সেরকম কিছুই ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু না! রাতের থাকার জায়গার কোনো অভাব হল না। তবে একসঙ্গে জায়গা পাওয়া গেল না। আমার থাকার ব্যবস্থা হল এক গরিব চাষির বাড়িতে। আমাকে ওরা সে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

অদ্ভুত সে বাড়ি। নিচু। মাটি থেকে ছয় ফুট উঁচুতে টিনের চাল। চাষির নাম মনোজ সিং। ছোটখাটো চেহারা। পঞ্চাশের মতো বয়স হয়েছে। ওর সঙ্গে ওর মেয়ে থাকে। অবশ্য আশেপাশে সে মেয়েকে দেখতে পেলাম না।

যেটা আমাকে অবাক করল, তা হল ওই লোকটার কথা বলার ধরন। একেবারেই চাষিসুলভ কথাবার্তা নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাই মনোজজী বলে কথা বলতে শুরু করলাম।

এরকম বাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা আগে আমার হয়নি। দুটো ছোট ছোট ঘর। তার একটাতে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। দুটো ঘরেই আসবাব বলে কিছু নেই। চাষি যে ঘরে থাকে, সেখানে একদিকে স্টোভ আর সামান্য কিছু

বাসনকোসন রাখা আছে। একটা বাটিতে দুধ রাখা আছে। কোনো বাথরুম নেই। সেটা অবশ্য এই গ্রামের কারুর বাড়িতে নেই বলে মনে হল।

মনোজজীর ঘরে এসে বসলাম। সন্ধে সাতটা। আকাশ তারার ভিড়ে ঢাকা পড়েছে। কলকাতায় আকাশে কখনও এতো সুন্দরভাবে তারামণ্ডলী ধরা দেয় না। দূরে এক কোণে কিছু কালো মেঘ জড়ো হয়েছে। পরে বৃষ্টি আসতে পারে।

আমাকে দেখার জন্য গ্রামের লোকেদের মধ্যে খুব আগ্রহ। ওই চাষি ছাড়াও ঘরের মধ্যে তিনজন এসে বসল। বুঝলাম খুব কম বাইরের লোকই এখানে আসে। এদের সবার রং বেশ ফরসা। ছোটখাটো চেহারা।

একটু কথা বলতেই বুঝলাম এরা বাইরের পৃথিবীর কোনো খবরই প্রায় রাখে না। এমন কি শরীর খারাপ হলেও এখানে ভালো ডাক্তার পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যেকেই খুব সহজ-সরল। যার বাড়িতে উঠেছি, তাকে সবাই বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। মনে হল তার কথা সব মেনে চলে। কারণটা ঠিক বুঝলাম না।

একটা জিনিস হঠাৎ চোখে পড়ল। ঘরের দেওয়ালে কি সব সংখ্যা লেখা। দেখতে কাছে এগিয়ে গেলাম। চমকে উঠলাম, এ তো বিখ্যাত সেই ফিবোন্যাচি নাম্বার সিকোয়েন্স। এখানে লেখা কেন? কে লিখেছে?

—ফিবোন্যাচি নাম্বার সিকোয়েন্স কি অনিলিখাদি?

অনিলিখার কথার মধ্যে বাধা এলো। সহেলী প্রশ্ন করেছে।

অনিলিখা একটু জল খেয়ে বলে উঠল—

১, ১,২, ৩,৫,৮,১৩,২১,৩৪,৫৫,৮৯ এটা হল ফিবোন্যাচি নাম্বার সিকোয়েন্স। এখানে খেয়াল কর—পরপর দুটো সংখ্যা যোগ করলে পরের সংখ্যাটা পাওয়া যায়। যেমন ১+১ হল ২, ১+২ হল ৩, ২+৩ হল ৫, ৩+৫ হল ৮। এরকম চলতেই থাকবে। ১২০২ সালে ইতালির এক গণিতজ্ঞ লিওনার্দো অফ পিসা এর উপরে একটা বই লেখেন। উনি পরে ফিবোন্যাচি ছদ্মনাম নেন। আর সেই নামেই এই সিকোয়েন্স। উনি খরগোশের একটা পরিবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে বাড়বে তা বোঝানোর জন্য এই সিকোয়েন্স ব্যবহার করেছিলেন।

একটু থেমে অনিলিখা ফের বলে উঠল—কি মাথায় ঢুকল? এবার আসল গল্পে ফেরা যাক। যা বলছিলাম।

আমাকে অবাক হয়ে দেওয়ালে লেখা ওই সংখ্যাগুলো দেখতে দেখে মনোজজী বলে উঠল—কি ভাবছ? এই সংখ্যাগুলো কোথা থেকে এলো, তাই তো? আমার সব সংখ্যাতেই খুব আগ্রহ।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই সংখ্যাগুলো তো ফিবোন্যাচি সিকোয়েন্সের মধ্যে পড়ে?

মনোজজী হেসে উঠল—না। না। আমি অতো শক্ত কিছু বুঝি না। এটা হল ফুলের পাপড়ির সংখ্যা।

লোকটার পাশে বসা টাকমাথা মাঝবয়সী লোকটা বলে উঠল—আমার মনোজ ভাই খুব পণ্ডিত লোক। ওর সঙ্গে কথা বললেই অনেক কিছু জানা যায়।

মনোজজী এ কথা শুনে একটু হেসে ফের বলে উঠল—আমাদের একটা অভ্যেস হল, যখনই কোনো ফুল দেখি, তার পাপড়ির সংখ্যা গুনি। এখানে তো নানান ধরনের অজানা ফুল পাওয়া যায়। জঙ্গল থেকে খুঁজে নিয়ে আসি। অবাক হয়ে দেখি তাদের সবার পাপড়ির সংখ্যা এই সংখ্যাগুলোর মধ্যেই কোনো একটা। এর বাইরে অন্য কোনো সংখ্যার পাপড়ি প্রায় হয়ই না।

৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯, ১৪৪

—মনোজজী পরপর বলে গেল।

—১৪৪, এতো পাপড়ি আবার কার হয়?

—কেন সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ির সংখ্যা ৫৫, ৮৯ বা ১৪৪ হয়।

—কিন্তু বাকি ফুলেরও কি পাপড়ির সংখ্যা এরকমই হয়?

—হ্যাঁ, জবার পাপড়ি ৫, ঝুমকোলতায় ৫, নয়নতারায় ৫, তারাফুলে ২১—প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাপড়ির সংখ্যা ওই সংখ্যাগুলোর মধ্যে।

—বাহ, দারুণ ব্যাপার তো!

মনোজজী একটু থেমে ফের হেসে বলে উঠল—আমি কি আর অত অংক বুঝি? সব থেকে বড় অংকের জাদুকর তো আমাদের সামনেই বসে আছে আর তা হল আমাদের প্রকৃতি। লক্ষ করেছ কিভাবে গাছের পাতাগুলো একটা শাখার চারদিকে ছড়িয়ে থাকে। একটা নির্দিষ্ট কোণ থাকে পরপর দুটো পাতার মধ্যে। অংকের সব সূত্র যেন ওদের জানা। আর এটা কি কারণে হয় জানো?

—যাতে ওরা সবাই একই রকম ভাবে আলো পায়, তাই তো?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমরাও তাই নিয়ম ভাঙতে পারি না। সব কিছুই প্রকৃতির নিয়মে চলে।

বলতে বলতে মনোজজী আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। একটু থেমে ফের বলে উঠল—আমরা চাইলেও প্রকৃতির নিয়ম ভাঙতে পারব না। আমাদের মেনে চলতেই হবে। না হলেই অনর্থ।

পাশে বসে থাকা তিনজন লোকও দেখলাম সায় জানিয়ে ঘাড় নাড়ল। একজন বলে উঠল—আমরা নিয়ম ভাঙব না। কোনোদিনও না।

খানিক বাদে আমরা সবাই মিলে বাজরার রুটি আর একটা ডাল খেলাম। বলতে নেই এরকম অখাদ্য ডাল আমি খুব কমই খেয়েছি। তাতে ডাল কম, জলই বেশি। তা আবার আধসেদ্ধ। এরা এতই গরিব যে কোনোরকমে এ ধরনের খাবার খেয়ে চালায়। তাতেই এরা খুশি। শুনলাম এরা হিড়িম্বার পুজো করে। এদের কাছে হিড়িম্বাই হল মূল দেবতা।

যে তিনজন ঘরে বসেছিল, তাদের মধ্যে একজনের নাম লখন। সে দেখি গারোয়ালি ভাষায় মনোজজীকে বলে উঠল—আচ্ছা, উলূপীর শরীর কেমন আছে?

—ভালোই আছে, তবে আমার মেয়ের যা বদমেজাজ, পাঁচজনের সামনে তো আর তাকে বার করা যায় না।

ওর মেয়েকে নিয়ে কথোপকথন পুরোটা না বুঝলেও বুঝলাম, ওর মেয়েকে সবাই ভালোবাসে, আবার বদমেজাজের জন্য খানিকটা এড়িয়েও চলে। একটু মাথা খারাপ আছে বোঝা গেল। ওদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, ওর মেয়ে উলূপী এখানেই থাকে। পাশের অন্য একটা ঘরে।

কোথায় সে ঘর জিজ্ঞেস করতে, মনোজজী ওর ঘরের অন্যদিকের একটা নিচু দরজার দিকে দেখাল। দেখলাম যেখানে রান্না করা হয় তার পাশে একটা নিচু দরজা আছে। আগে ভেবেছিলাম ওটা বোধহয় বাড়ি থেকে বেরোনোর আরেকটা রাস্তা। ওদিকে যে আরেকটা ঘর আছে তা খেয়াল করিনি।

আমরা কথা বলছি। এর মধ্যে হঠাৎ দেখি আরও দুজন লোক বাইরের দরজার কাছে উঁকি মারছে। মনোজজী ওদের দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে

আবার ফিরে এলো। এসে একটা খুব আনন্দের খবর জানাল। গ্রামে একজনের নাকি বাচ্চা হয়েছে। এমনিতে বেশ কয়েক দিন বাদে হওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ কয়েক ঘণ্টা আগে প্রসববেদনা ওঠে। যাই হোক এখন সব নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে। মা ও মেয়ে দুজনেই ভালো আছে। ঘরের সবার মধ্যেও আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওরা বেশ কিছু কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালাল। শুনলাম এটাই নাকি এখানকার রীতি। নতুন কাউকে এভাবে স্বাগত জানানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের প্রায় সবাই এসে হাজির। এ আনন্দে শরিক হতে।

লক্ষ করলাম মনোজজী এর মধ্যেই একজন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলছে। ওদের কথার মাঝে অনেকেই সে লোকটাকে এসে প্রণাম করে যাচ্ছে।

খানিক বাদে মনোজজীকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা কে হয়?

মনোজজী বলে উঠল—বুধুয়া। এই গ্রামের সব থেকে বয়স্ক লোক। সবাই ওনাকে খুব ভালোবাসে আর শ্রদ্ধা করে। যখনই কেউ বিপদে পড়ে, উনিই সবার আগে এগিয়ে আসেন।

খুব ভালো লাগল শুনে। এরা তাহলে গুরুজনদের এরকম ভাবে সম্মান করে।

রাত নটা নাগাদ সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেল। পূর্ণিমা আর কয়েকদিনের মধ্যে। কিন্তু চারদিক থেকে কালো মেঘটা যেভাবে চাঁদটাকে ঘিরে ধরেছে, মনে হচ্ছে কেউ যেন একটা সোনার থালায় কালির দোয়াত উল্টে ফেলেছে। আমিও মনোজজীর বাড়িতে ফিরে এসে ওর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথার পর রাত দশটার সময় শুয়ে পড়লাম।

একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। একা শোবো। তাও পাশের ঘরে এমন একজন যাকে প্রায় চিনি না।

তখনকার দিনে তো আর আমাদের কাছে মোবাইল ফোনও থাকত না। তাই মিলন বা ধৃতিমানকে রাতে দরকার হলে জানানোরও কোনো উপায় ছিল না।

ঘুম আসছিল না। রাত বারোটা নাগাদ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল।

টিনের চালের উপরে পড়া বৃষ্টি আর হাওয়ার কনসার্ট শুনতে শুনতে কখন জানি ঘুমিয়ে পড়লাম।

খানিক বাদে কিসের শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল পাশের ঘরে কিসের যেন আওয়াজ পাচ্ছি। একটা খসখস আওয়াজ। মাটিতে চাদর পেতে শুয়েছিলাম, মনে হল পাশে ঘরে যেন কিছু একটা চলে বেড়াচ্ছে।

পাশের ঘরে ঠিক যেন কোনো হাঁপানি রুগি আছে। আর সে মাঝে-মধ্যে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। দরজা খোলার সুযোগ নিয়ে কেউ ভেতরে চলে আসেনি তো! পাশে ব্যাগের মধ্যে। টর্চ ছিল টর্চ নিয়ে চাদরের মধ্যে থেকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু টর্চ জ্বাললাম না। যদি মনোজজীর ঘুম ভেঙে যায়।

কান খাড়া করে আবার শুনলাম। একটা আওয়াজ আসছে। কেউ যেন জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। একটু থেমে আবাার বড় করে নিশ্বাস। অনেকটা খানিকক্ষণ দম বন্ধ করে যেভাবে কেউ তারপরে নিঃশ্বাস নেয়।

চোখ একটু অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেলে পাশের ঘরে গেলাম। আওয়াজটা যেন হঠাৎ করে থেমে গেল। মনোজজী ঘরের একধারে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে।

নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। মনে হল পাশের ঘরের দরজাটা যেন সামান্য খোলা। কোন কিছু কি তাহলে ওর মেয়ের ঘরে ঢুকেছে? ঢুকে দেখবো?

শুনেছিলাম মেয়ে স্বাভাবিক নয়। এতো রাতে কোনোরকম পরিচয় ছাড়া তার ঘরে ঢোকা কি ঠিক হবে?

একটু দ্বিধা নিয়ে আবার আমার ঘরে ফিরে এলাম।

ভোরের দিকে আবার ঘুম ভেঙে গেল। আবার সেই একই শব্দ শুরু হয়েছে। কিছু একটা যেন পাশের ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবারে তাড়াতাড়ি করে উঠে পাশের ঘরে চলে এলাম। বাইরে এখন সামান্য আলো হয়েছে। মনোজজীর ঘরের ছোট জানলা দিয়ে প্রথম সূর্যের ঘুমভাঙা আলো এসে মাটিতে পড়েছে। কিন্তু ঘরে কিছু নেই। কোনো কিছুই দেখতে পেলাম না। মনোজজী এখনও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। বাইরের দরজা বন্ধ নয়। ভেজানো। হঠাৎ চোখ পড়ল দুধের বাটিতে। বাটি থেকে দুধ খানিকটা বাইরে মাটিতে এসে পড়েছে। পাশে মেয়ের ঘরের দরজা সামান্য খোলা। তাহলে কি সেই এসেছিল এখন?

সাহস করে পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। মাঝের দরজা খুলে অন্য ঘরে ঢুকলাম।

ছোট ঘর। এখানে কোনো জানলা নেই। ঘরের মধ্যে অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। টর্চটা এবার জ্বাললাম। এখানে কি করে কেউ থাকে, ভেবে অবাক হলাম। ঘরের এক কোণে একটা কাঠের বাক্স। কিছু মাটির কলসি রাখা। একটা ছোট টেবিল। তার উপর কিছু জামাকাপড় রাখা। একটা মেয়ের ঘরে মেয়েদের কোনো পোশাক চোখে পড়ল না। তাহলে কে থাকে এই ঘরে? আর শব্দই বা কিসের?

তাহলে হয়তো আমার মনের ভুল।

এর মধ্যে আবার খুব কাছ থেকে আওয়াজটা শুনতে পেলাম। সেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস।

সেই শব্দের উৎসটাকে এবার খুঁজে বার করতে অসুবিধে হল না। আসছে আমার সামনে রাখা মাটির কলসিটা থেকে। আর ওই কলসি থেকে আস্তে আস্তে উঠে আসছে একটা লাঠির মতো জিনিস। হঠাৎ ভয়ে চমকে উঠলাম। ওটা লাঠি নয়, একটা বিশাল কিং কোবরার ফণা। আমার থেকে ঠিক দেড়ফুট দূরে মাটি থেকে পাঁচ ফুট উপরে উঠে এসেছে ফণাটা। আর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। খানিকক্ষণের জন্য ঘাড় অব্দি উঠে আসা ওই রাগী দৃষ্টির সামনে সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এক মুহূর্তের জন্য ভয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরে একটু পিছিয়ে আসার চেষ্টা করতেই পিছনে হঠাৎ মনোজজীর গলা শুনলাম।

—কোনো ভয় নেই, আমি এসে গেছি। উলূপী কিছু করবে না।—একটু থেমে—

উলূপী, উলূপী, শান্ত হো যা।—বলে দেওয়ালে টোকা মারল মনোজজী।

সাপটা দেখি একটা বড় শ্বাস ফেলে ফের কলসির মধ্যে মাথা নিচু করে নিল।

মনোজজী ফের আমাকে বলে উঠল—এখানে না এলেই পারতে, আমি নেহাত টের পেয়েছিলাম। নাহলে একটা ছোবলেই সব শেষ।

—আসলে একটা শব্দ পাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম কিছু একটা ঢুকেছে ঘরে। তা এটা কি আপনার পোষা সাপ?

প্রশ্নটা শুনে মনোজজীর গলা হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেল। খসখসে গলায় বলে উঠল—কি নামে ডাকলাম শোননি? ও সাপ না। আমার মেয়ে। উলূপী।

—বলে আমার দিকে আগুনের দৃষ্টিতে তাকাল। আর তখনই লক্ষ করলাম ওর চোখের সঙ্গে কিং কোবরার চোখের অসম্ভব মিল। একটা প্রায় গোল চোখের মধ্যে কালো গোল মণি। চোখের ধার দিয়ে সেরকমই চামড়ায় ভাঁজ।

আমি কি বলব বুঝে উঠতে পারলাম না। ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ভোর হয়ে এসেছিল। শিক দেওয়া জানলা দিয়ে ঢুকছিল ঠান্ডায় কাঁপতে থাকা ভোরের রোদ্দুরের আলোছায়া।

বাড়ির বাইরে গিয়ে বসলাম। কেন জানি না ওই ঘরে থাকতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। খানিক বাদে মিলন ও ধৃতিমান চলে এলো। ম্যাগি দিয়ে আমরা সকালের ব্রেকফাস্ট সারলাম। মনোজজীকেও খাওয়ালাম। ও ওরকম জিনিস আগে কোনোদিন খায়নি।

আমাকে উলূপীর সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে বারণ করেছিল। খানিক বাদে সকাল আটটা নাগাদ আমরা সাকরির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। প্রায় পনেরো কিমি পথ হাঁটতে হবে। গ্রাম থেকে বেরোনোর সময় একটা জায়গায় দেখি বেশ কিছু লোকের ভিড়। এগিয়ে গিয়ে শুনলাম কালকের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, বুধুয়া মারা গেছেন। মৃত্যুর কারণ কি জিজ্ঞেস করতে একজন বলে উঠল—সাপের কামড়। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে আর কোনো উত্তর দিল না।

এটা কি কোনোরকম কোইন্সিডেন্স? তাহলে কি উলূপী এখানেই এসেছিল মাঝরাতে? আর তাই আমি ওই আওয়াজ শুনেছিলাম।

ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে গিয়ে দেখলাম আমাদের পাশে কিছু দূরে মনোজজী দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গেলাম। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ হচ্ছিল। তাই জিজ্ঞেস করে উঠলাম—আচ্ছা, এ গ্রামে কতজন থাকে?

মনোজজী নির্বিকার ভাবে বলে উঠল—৮৯।

যা ভেবেছিলাম। ফিবোন্যাচি সিকোয়েন্সের একটা সংখ্যা।

—আর তাই নতুন কেউ এলে, কাউকে তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয়, যাতে গ্রামের জনসংখ্যা একই থাকে। কোনোভাবেই ফিবোন্যাচি সিকোয়েন্সের

বাইরে এ সংখ্যা হতে পারে না। আর সে কাজটা সারে আপনার মেয়ে উলূপী। তাই তো?

মনোজজী আরেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল—বুধুয়াকাকুর হাতে আমি মানুষ। খুব ভালো লোক ছিল। কিন্তু আমরা তো আর প্রকৃতির নিয়মের বাইরে যেতে পারি না। তাই ওই সংখ্যাগুলোর বাইরে অন্য কোনো সংখ্যা হয়, এরকম আমরা হতে দিতে পারি না। তাই কেউ এলে, কাউকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। এটাই এখানকার নিয়ম। চলে আসছে গত কয়েকশো বছর ধরে।

মনোজজীর চোখ ছলছল করে উঠল। ফের বলে উঠল—আমার বাবা খুব কম বয়সে মারা যান। আমি মানুষ ওই বুধুয়ারই হাতে।

বলে আমার দিকে ফের স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। ফের মনে করিয়ে দিল আজকে ভোর রাতে দেখা সেই দৃষ্টিকে। উলূপীকে।

অনিলিখা থামল। বিশ্বজিৎদা বেশ কয়েকবার কেশে উঠে বলে উঠল—সবই তো বুঝলাম অনি। কিন্তু বলো তো, ওদের মধ্যে যখন কেউ মারা যায়, তখন কি হয়? ইচ্ছে করলেই তো আর কেউ জন্মাতে পারে না?

অনিলিখাকে চুপ করে থাকতে দেখে আমরা ভাবলাম, এই প্রথম বুঝি শনিবারের ইতিহাসে বিশ্বজিৎদা অনিলিখাদিকে চেকমেট করে দিল।

কিন্তু না। অনিলিখাদি ফের বিশ্বজিৎদাকে উল্লেখ করে বলে উঠল—এই প্রথম একটা ভালো প্রশ্ন পেলাম তোমার কাছ থেকে। আর প্রশ্নটার উত্তর পেয়েছিলাম। মনোজজীর চোখটা খেয়াল করে দেখার পরে।

—মানে?

—জানতে পেরেছিলাম, ওই ৮৯ সংখ্যাটার মধ্যে মনোজজীকে ধরা হয়নি। হয়তো কখনও কখনও দরকার হলে ধরা হয়।

বিশ্বাস

রিকশা থেকে নামার পর সুমিত লক্ষ করল বাবা রিকশাওয়ালার সঙ্গে কিছু কথা বলছে।

কানে এলো—বাবু, আমাকে কিছু টাকা দেবেন?

—কেন? ওই তো যা ভাড়া চাইলে, তাই তো দিলাম।

—না, না, সে তো ভাড়া। আমাকে যদি একটু টাকা সাহায্য করতেন?

—কেন? কিছু অসুবিধে হয়েছে তোমার?

—ছেলেটার পেটে বড় একটা টিমার না কি পাওয়া গেছে! ডাক্তার বলছে খুব তাড়াতাড়ি অপারেশন করতে হবে। কি যে করি! অনেক টাকার ব্যাপার।

—টিউমার? সে কি? কোথায়?

—পেটে। ওই কিডনি না কি আছে না, তাতে। এই দেখুন।—বলে লোকটা একটা কাগজ এগিয়ে দিল বাবার হাতে।

সুমিত পাশ থেকে উঁকি মারল। পুরোনো কাগজ। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন যেরকম হয়, সেরকম। কিন্তু অনেক পুরোনো। সইটা ভালো করে পড়ারও উপায় নেই। তার নীচে যে তারিখ লেখা, তাও আবছা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে বেশ কয়েকবার কাগজটা বৃষ্টিতে ভিজেছে।

—তা এতোদিন অপারেশন করাওনি?

—কি করি বলেন? এতো টাকার ব্যাপার। আস্তে আস্তে টাকা জমাচ্ছিলাম।

—তা সরকারি হাসপাতালে যাওনি?

—ওখানে কি আর চেনাজানা ছাড়া ভর্তি হয়? কতবার গেছি। বেড পাইনি। তা আমার প্রায় উনত্রিশ হাজার টাকা জড়ো হয়ে গেছে। আর মাত্র এক হাজার বাকি। ব্যাস। তাহলেই ডাক্তার বলেছে অপারেশন্ করতে পারবে। ছেলেটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে কর্তা। চোখে দেখা যায় না। ডাক্তার তো বলেছে এখনই অপারেশন না করলে আর বাঁচবে না।

—ছি ছি। তা ওর এ ব্যথা কত মাস ধরে হচ্ছে?

—তা ধরেন বছরখানেক। কি আর করি বলেন। এই বৃষ্টি-বাদলার দিনেও বেরিয়ে পড়েছি সকাল থেকে। যদি একটু বেশি রোজগার হয়। সকাল থেকে শুধু ছাতু খেয়ে আছি। তাতেও দেখেন কত আর টাকা হল সারাদিনে। এর থেকে আর কি থাকে—বলে লুঙ্গির খুঁট থেকে কিছু ভিজে টাকা বার করে দেখাল—আজ এই রোজগার। আরও কয়েক মাস লেগে যাবে। তা কর্তা, আপনি দুশো টাকা দিতে পারবেন কি?

সুমিতের বাবা মানিব্যাগ খুলে একটা হাজার নোট বার করে দেয়।—রেখে দাও ভাই। তুমি কাল এসে আমার সঙ্গে একটু দেখা করো। আমি এখানেই ৩বি ফ্ল্যাটে থাকি। আমার নাম আবীর ঘোষ। দেখি যদি কালকের মধ্যে আরও কিছু টাকা জোগাড়ের ব্যবস্থা করতে পারি। যে করেই হোক অবিলম্বে তোমার ছেলের অপারেশনের ব্যবস্থা করতেই হবে।

লোকটা টাকাটা নিয়ে বাবার পায়ের কাছে বসে পড়ে। হঠাৎ করে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে—কি যে বলি কর্তা। আপনি ভগবান। আপনাকে যে কি বলব—কথা আসছে না। এবার খোকার অপারেশনটা করে ফেলতে আর—লোকটার গলা যেন আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে আসে। তারপর তাড়াহুড়ো করে আবার সাইকেল রিকশাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সুমিত বলে ওঠে—বাবা, তুমি অতগুলো টাকা একেবারে দিয়ে দিলে? লোকটা যদি মিথ্যে বলে থাকে। এই জন্যই মা বলে সবাই তোমায় ঠকায়। দেখলে না লোকটা একটুও দাঁড়াল না। যেন কেউ দেখে ফেলবে এই ভয়ে টাকাটা নিয়ে ছুটে পালাল।

একটু যেন গম্ভীর হয়ে যায় ওর বাবা।

তারপরে আস্তে আস্তে বলে ওঠে—হয়তো ও তাড়াতাড়ি ডাক্তারের চেম্বারেই ছুটল। চল, যাওয়া যাক।

সুমিত একটু রেগে যায়। অভিমানে বলে ওঠে—আমার ক্রিকেট ব্যাট কিনে দিলে না তুমি। কত করে বললাম। তুমি বললে অনেক দাম। বললে তোমার কাছে অত টাকা নেই। ওটা তো হাজার টাকাতেই হয়ে যাচ্ছিল।

—তোর ক্রিকেট ব্যাট আর ওর ছেলের অপারেশন কি এক?

—কিন্তু বাবা, একটু থেমে ফের বলে উঠল সুমিত—আমার মনে হয় ওই লোকটা তোমায় ঠকিয়েছে। আমার ঠিক মনে নেই, তবে তোমার কাছে আগেও একবার এই লোকটাই নিয়েছিল। বেশ কয়েক মাস আগে। আমরা স্টেশনে নেমে রিকশা ধরছিলাম। ও অবশ্য তখন রিকশা চালচ্ছিল না। ওই একই রকম কাগজ এনে সাহায্য চেয়েছিল, মনে পড়ে? তখনও তুমি অনেক টাকা দিয়েছিলে।

—সে তো অনেক দিন আগের কথা। একই লোক কি? হতেও পারে অবশ্য। আমার অতো মনে থাকে না।

—তা, তাও তুমি দিলে?

—মনে আছে, সেদিন ও লোকটা তো কুড়ি না তিরিশ হাজার টাকা বাকি বলেছিল। হয়তো খানিকটা জোগাড় করে ফেলেছে—বলে একটু হেসে সুমিতের বাবা ফের বলে উঠল—জানিস তো সুমু, মাঝে মাঝে বোকা হওয়া ভালো। তাতে যদি কারুর ভালো হয়। ধর ওর ছেলের সত্যি করেই শরীর খারাপ, অবিলম্বে অপারেশন দরকার, আর আমি টাকা দিলাম না, তাহলে কি হত? একটা গল্প বলি শোন। এ আমারই কথা।

বলে একটু থামল ওর বাবা। তার পরে বলে উঠল—আমার বাবা তখন সবে দেশভাগের পরে আমাদের নিয়ে এদিকে এসেছে। আমাদের অবস্থা বেশ খারাপ। যা জমিজমা ছিল সব ফেলে এদিকে। আমি তখন সবে স্কুলে পড়ি। কোনোরকমে একটা ছোট ঘরে ভাড়া করে থাকি। তার মধ্যে বেশ কয়েক দিন ধরেই মার শরীরটা ভালো ছিল না। রোজ জ্বর আসত। সঙ্গে সমানে একনাগাড়ে কাশি। হঠাৎ করে মা যেন অনেক রোগাও হয়ে গিয়েছিল। তা ডাক্তার দেখে বলল টিউবারকিউলোসিস। তখন টিবির চিকিৎসায় অনেক টাকা লাগত।

তা আমরা কি করি, বাবার কাছে কিছুই টাকা ছিল না। আর যা সামান্য দামি কয়েকটা জিনিস ছিল, তাও কয়েক দিনের মধ্যে টাকার জোগাড়ে বিক্রি হয়ে গেল। চিকিৎসা আর চালানো সম্ভব হচ্ছিল না।

একদিন আমি বাবা-মার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গেছি। ডাক্তার দেখি বাবাকে খুব বকাবকি করলেন। আসলে যা যা খাওয়ার কথা ছিল, আর চিকিৎসার জন্য যা ওষুধ দরকার ছিল, তার জন্য আর টাকা ছিল না বাবার কাছে। বাবা সাধ্যমতো যতটা সম্ভব সবই করছিল। আমি তা ভালো করেই জানতাম।

আমার বাবা কখনও কারুর কাছে মুখ ফুটে সাহায্যও চাইতে পারত না। তা সেদিন বাড়ি ফিরে দেখি বাবা সারা রাত ঘুমোল না। সকাল হতে আমায় বলল—চল সন্তু। আমার এক দূরাত্মীয় কলকাতায় থাকেন। আমার বাবার সঙ্গে এক স্কুলেও পড়েছেন। ওখানে গিয়ে দেখি কি হয়। তবে মনে হয় না দেবেন। আমাকে সেরকম ভাবে চেনে না। এতগুলো টাকা।

আমরা তবু গেলাম। মাকে ঘরে রেখে। বাড়ির বাইরে থেকে বাবা প্রায় ফিরেই আসছিল। আমাকে বলল, ফিরে যাই। গিয়ে কি আর লাভ হবে। উল্টে দুটো কথা শুনতে হবে হয়তো। কি বলিস সন্তু?

আমাকে ওই একদিনই জিজ্ঞেস করেছিল বাবা। তা আমি বললাম, কি আর বলবে বাবা। সেরকম হলে আমরা চলে আসব। এতোটা এসেছি। দেখাই যাক না।

তা শেষ পর্যন্ত আমরা গেলাম। বড় বাড়ি। আমি বাইরের ঘরে বসলাম। বাবাকে ভেতরের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল বাড়ির লোক এসে। শুনলাম বাবা ভেতরে কারুর সঙ্গে কথা বলছে, যদিও বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ভেতরে যার সঙ্গে কথা বলছে সেও অসুস্থ মনে হল।

কি কথা হল বুঝলাম না।

খানিক বাদে দেখি বাবা মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগটা ফাঁকাই মনে হল।

আমি বলে উঠলাম—বাবা, ওরা টাকা দেয়নি?

বাবার মুখটা আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখটা যেন জলে ভিজে। হেসে বলে উঠল—হ্যাঁ, দিয়েছেন রে সন্তু। একেবারে আমার কথায় বিশ্বাস করে

একটা চেক দিয়ে দিলেন। অনেক টাকার। আমাকে আগে কোনোদিন দেখেনওনি। কত বড় মনের মানুষ দেখেছিস? এবারে মা দেখবি ঠিক সুস্থ হয়ে উঠবে। আমি এ টাকা ঠিক শোধ করে দেবো। খুব তাড়াতাড়ি।

সুমিতের বাবা একটু থেমে ফের বলে উঠল—মা সেবারে বেঁচে গিয়েছিল। আর তাই আমার কাছে যখনই কেউ সাহায্য চায়, আমার সেই দিনটার কথা মনে পড়ে যায়। বাবার সেই মুখটা ভেসে ওঠে। তখন মনে হয় সামনের লোকটাকে বিশ্বাসই করা উচিত। না হয় বড়জোর আরেকটু ঠকব। কিন্তু মুহূর্তের ঠকার থেকে নিজেকে মানুষ হিসেবে ছোট না করা অনেক বেশি ভালো, তাই না?

সুমিত বাবার হাতটা এগিয়ে এসে ধরল। তারপরে দুজনে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

একটু অন্যরকম

—রাজ, আজ তোমার বাবা আসেননি?—বাংলার টিচার অর্পিতাদি বলে উঠলেন।

—না, বাবার আসলে অনেক কাজ ছিল।

—আর মা?

—বাবা না এলে মাও তো আর একা আসতে পারে না।

—তুমি বাড়িতে গিয়ে বলো আজকের মতো দিনে ওনারা যাতে স্কুলে আসেন। আজকে তুমি কর্ণের এতো সুন্দর অভিনয় করলে, এতো ন্যাচারাল, আমরা সবাই তা দেখে মুগ্ধ। তোমার বাবা-মা দেখলে ওনাদেরও খুব ভালো লাগত। দেখলে বাকি সবার অভিভাবকরা এসেছিল।

কি যেন বলতে গিয়ে আবার থেমে গিয়ে খানিক বাদে রাজ অস্ফুটে বলে উঠল—পরের বারে ঠিক আসবে ওরা।

আজকে ওদের স্কুলে নাটক ছিল। মহাভারতের একটা ছোট অংশ নিয়ে।

পাণ্ডবরা-কৌরবরা কে কিরকম অস্ত্রশিক্ষা পেয়েছে, তারই প্রদর্শনী চলছে। উপস্থিত আছেন রাজপরিবারের সবাই। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী, গান্ধারী, বিদুর, আরও অনেকে। উপস্থিত আছেন কৃপাচার্য, দ্রোণ আর দেশ-বিদেশ থেকে আসা অনেক রাজপরিবারের সদস্য।

তখন সবে অর্জুনের অস্ত্র প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। সবাই মুগ্ধ। এমন কি ভীষ্ম দাঁড়িয়ে উঠে করতালি দিয়ে উঠেছেন। এর মধ্যে হঠাৎ এক কমবয়েসী যুবকের প্রবেশ। তেজস্বী চেহারা, কিন্তু পোশাক সাধারণ। কী তার ঔদ্ধত্য! অর্জুনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সে কিনা বলে উঠবে যে অর্জুন যা করেছে, ও তাই করে দেখাবে! তার থেকেও সে ভালো তীরন্দাজ!

এরকম সম্ভব? হেসে উঠেছিল সবাই। কিন্তু তাদের ভুল প্রমাণিত করে, ছেলেটি ঠিক তাই করে দেখাল। নাম কর্ণ। আর তারপরই সে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের অনুমতি চাইল। সবারই ধারণা হয় যে এ নির্ঘাত অন্য কোনো দূরদেশের রাজপুত্র। রাজরক্ত না থাকলে এ শৌর্য দেখানো যায় না।

কিন্তু অর্জুন তো আর পরিচয়হীন কারুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। তাই সে কর্ণের পরিচয় জানতে চাইবে। কর্ণ উত্তর দেবে না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ঠিক এই সময় এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হবে সারথি অধিরথ। সেই জানাবে কর্ণের পরিচয়। জানাবে যে কর্ণ তারই পুত্র। কর্ণের স্পর্ধায় সে নেহাতই বিব্রত। সবার কাছে সে ক্ষমা চেয়ে নেবে তার ছেলের এই ভুলের জন্য।

কর্ণের পিতা হল অধিরথ, যে কিনা সামান্য এক সারথি, ধৃতরাষ্ট্রের রথ চালায়। তখন কর্ণ মাথা নিচু করে পিতার কাছে এসে তাকে প্রণাম করবে আর অধিরথ কর্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরবে।

হেসে উঠবে উপস্থিত সব দর্শক। ভীম অপমান করে বলে উঠবে তখনই সে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে। কোন অধিকারে সে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে?

তখন কর্ণের পক্ষে দাঁড়াবে শুধু দুর্যোধন। দুর্যোধন বলে উঠবে—কর্ণ, আমি তোমাকে আজই অঙ্গরাজ্যের রাজ্য ঘোষণা করলাম। আজ থেকে তুমি হলে আমার বন্ধু। তুমি হলে কৌরবদের রাজপরিবারের অংশ। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তোমার আর কোনো বাধা রইল না। যা পরিচয় দরকার ছিল, তা তুমি এখনই পেয়ে গেল।

এরকমই রিহার্সাল হয়েছিল অনেকবার। নাটকের ডায়ালগ যাতে কেউ ভুলে না যায়, তার জন্য বারবার মহড়া হয়েছিল।

কিন্তু আজ একটু অন্যরকম হয়ে গেল।

অর্জুন মানে কিংশুক দ্বিতীয়বার পরিচয় জানতে চাইতেই রাজ সেসব মুখস্থ লাইন ভুলে সদর্পে ওর আসল পরিচয় জানিয়ে বলে উঠল—আমি সুতপুত্র কর্ণ। এটাই আমার প্রথম পরিচয়। সে পরিচয় আমার এ অস্ত্রের পরিচয়ের থেকে অনেক বেশি গভীর।

সবাই হেসে উঠল। ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে ওঠার আগেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে দীপু মানে দুর্যোধন শেখানো মুখস্থ কথা গড়গড় করে বলে উঠল—কর্ণ, কর্ণ, আমি তোমাকে আজই অঙ্গরাজ্যের রাজা ঘোষণা করলাম। আজ থেকে তুমি হলে আমার বন্ধু। তুমি হলে কৌরবদের রাজপরিবারের অংশ। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তোমার আর কোনো বাধা রইল না। যা পরিচয় দরকার ছিল, তা তুমি এখনই পেয়ে গেলে।

কিন্তু একি কথা! কর্ণ দুর্যোধনের কথাকে কোনোরকম পাত্তা না দিয়ে বলে উঠল—আমি এ রাজ্য চাই না। যে সমাজ আমার বাবার পরিচয় পেয়ে হাসে, সে সমাজে আমি রাজা হয়ে থাকতে চাই না। আমি সুতপুত্র হয়েই থাকতে চাই। আর ওই রাজত্ব আমি দান হিসাবে চাই না। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি নিজেই তা অর্জন করে নেব।

এরকম কথা ছিল না।

কর্ণের বাবা অধিরথের ভূমিকায় ছিল ক্লাস টেনের অর্ক। সে তো প্রায় ভয় পেয়ে উলটো দিকে ছুট লাগিয়েছিল আরেকটু হলে। দীপু মানে দুর্যোধনও এ পরিস্থিতিতে কি বলবে বুঝতে না পেরে থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ তো ভারী সমস্যা।

নেহাৎই তন্ময় স্যার ছিলেন। ভীষ্মের ভূমিকায়। কোনোরকমে পরিস্থিতি সামলেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত রাজ্যে রাজি হয়নি কর্ণ। এমনকি অর্জুনের ফিসফিসিয়ে বলা পরশুর ক্রিকেট ম্যাচের টিকিটের প্রলোভনেও সাড়া দেয়নি। সে কারো কোনো দান স্বীকার করবে না। সে অর্জন করবে এই সম্মান।

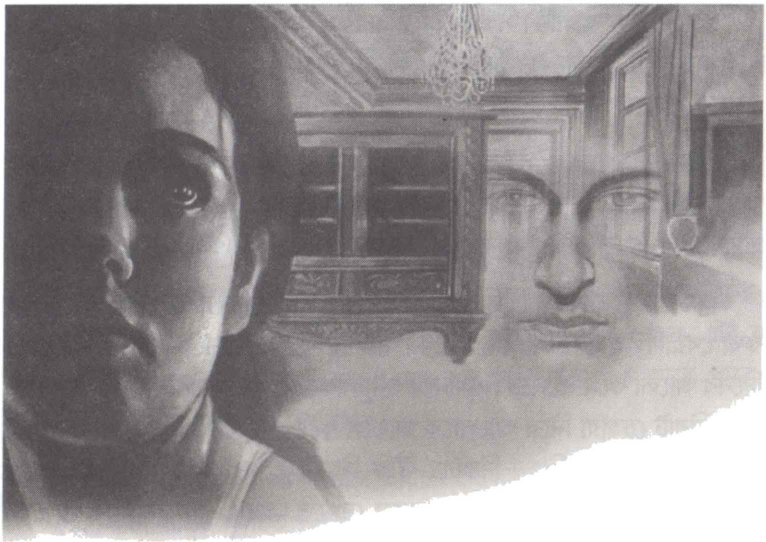
উপস্থিত দর্শকরা এতো কিছু বোঝেনি। বরঞ্চ এই চমক তাদের ভালোই লেগেছে। ভেবেছে এরকম পরিবর্তনই বুঝি এ নাটকে হওয়ার কথা ছিল।

রাজ জানে যে ও আজকে ওইটুকু অংশ আর অভিনয় করেনি। ওর শুধু মনে পড়ে গিয়েছিল ওর আসল পরিচয়। ওর বাবার পরিচয়। যে ট্যাক্সি চালায়। আর দিনরাত গাড়ি চালিয়ে এ স্কুলের খরচ জোগাড় করে।

কোনোদিন রাজ চায়নি, ওর বাবা এই স্কুলের ধারেকাছে আসুক। এই নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ার অনেক খরচ। ওর বাবা অনেক কষ্ট করে পড়াচ্ছে ও তা জানে। কিন্তু বাকি যারা ওর সঙ্গে পড়ে তাদের তো আর ওর মতো অবস্থা

নয়। ও এতোদিন চায়নি যে তারা ওর বাবার পরিচয় জেনে যাক। আড়ালে এ নিয়ে হাসাহাসি করুক। আর তাই আজকে ও বাবা-মাকে আসতে বারণ করেছিল। কিন্তু কি যে হল শেষে! সব লাইন ভুলে গেল। রাজ পিঠের ব্যাগটা নিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। বাংলার টিচার অর্পিতাদি মুচকি হাসলেন। উনি ইচ্ছে করেই চেয়েছিলেন রাজ এই ভূমিকায় অভিনয় করুক। উনি লক্ষ করেছিলেন স্কুলের সামনে অনেক সময়ই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়, আর খানিক বাদে আবার ফিরে যায়। বাকি পরিচয়টা স্কুলের ফাইল থেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। রাজের বাবার।

আজকে খুঁজে পেলেন এক অন্য কর্ণকে। যে তার সুতপুত্র পরিচয়ের মধ্যেই তার আসল পরিচয় খুঁজে পায়।



ছেলেটা এখনও বন্ধু খোঁজে

নাহ, ঘরের তুলনায় বুককেসটা সত্যি অনেক বড় হয়ে গেছে। বিশাল ড্রয়িংরুমের একদিকের অর্ধেক দেওয়ালটা ঢাকা পড়ে গেছে বুককেসে। মেহগনি কাঠের ভারী সুন্দর কাজ করা বুককেস। মাঝের অংশটা একটু এগিয়ে আছে। বেরিয়ে থাকা অংশের দু'ধারে দুটো কাঠের স্তম্ভ। পুরো বুককেসটার প্রান্তে আরও দুটো কাঠের স্তম্ভ। দেখে মনে হয় ঠিক যেন একটা ঝুলবারান্দাওয়ালা বাড়ি জমিদারি দর্পে দাঁড়িয়ে আছে। নীচের থেকে তিনফুট পুরোটা কাঠের। তার উপরের অংশে নানান সাইজের তাক করা। আর তাতে ভারী সুন্দর রঙিন কাচের পাল্লা। কাল অ্যান্টিক শপ থেকে নিয়ে আসা অব্দি বারবার বুককেসের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে অনিলিখা। অজানা কীসের আকর্ষণে যেন চোখ ফেরানো যায় না।

অ্যান্টিক শপের লোকটা অনিলিখাকে বলেছিল—এত বড় বুককেস, তাই কেনার লোক কম। কিন্তু এত ভালো কাঠ, এমন সুন্দর কারুকার্য খুব কম বুককেসেই থাকে। আর নিশ্চিত না-হলেও আমার তো দেখেই মনে হয় অন্তত দেড়শো বছরের পুরোনো। এরকম জিনিস আমার কাছে খুব কমই আসে। আপনি প্রায় জলের দরে পেয়ে গেলেন। আমার এখানেও রাখার অসুবিধে হচ্ছিল। তাই বাধ্য হলাম বিক্রি করে দিতে।

কথাটা ভুল বলেনি। সত্যিই তাই। এরকম কাঠের কাজ চট করে দেখা যায় না। অনেকটা রকোকো স্টাইলের কাঠের কাজ। দেখেই মনে হয় খুব ধনী কোনো লোকের বাড়িতে ছিল এটা।

সোফার উপরে বসে নিউরাল সায়েন্সের উপরে লেখা একটা বই পড়ছিল অনিলিখা। সন্ধে হয়ে এসেছে। ঘরের আলো জ্বালতে উঠে দাঁড়াল অনিলিখা। তারপর কী যেন ভেবে আবার ওই বুককেসের দিকে এগিয়ে গেল।

আসলে বুককেসের পিছনের দিকটা কখনও ভালো করে দেখা হয়নি। দেখার কথা খেয়ালই হয়নি বলা যায়। ঘরের একদিকে বড় কাচের জানলা। কিন্তু এখন দিনের আলো কমে এসেছে। এমনিতেও বুককেসের পিছন দিকটায় আলো আরও কম। বিরাট চেহারা নিয়ে আলোকে আড়াল করে যেন দাঁড়িয়ে আছে। খানিকটা এগিয়ে বুককেসের পিছন দিকটায় উঁকি দিতেই অবাক হয় অনিলিখা। আগে খেয়াল করেনি। পিছন দিকটা অন্যরকম দেখতে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন একটা অন্য ফার্নিচারের সামনের দিক। একই রকম কাঠের কারুকার্য। তবে ডিজাইনটা সম্পূর্ণ আলাদা। কোনো কাচের পাল্লা নেই।

কিন্তু বুককেসের পিছনের অন্ধকারের মধ্যে ওটা কী? হঠাৎ অনিলিখার হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল। একটা বাচ্চা ছেলে যেন বুককেসের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। অন্ধকারে শুধু মুখটাই যেন দেখা যাচ্ছে।

—হু আর ইউ?—অনিলিখার গলার স্বর মুহূর্তের জন্য কেঁপে গেল।

ও আরও একটু এগিয়ে গেল বুককেসটার দিকে। ভালো করে দেখার জন্য।

হ্যাঁ, ওই তো স্পষ্ট ছেলেটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বছর বারো বয়েস হবে। পাঁচ ফুটের মতো হাইট। সোনালি রঙের চুল। সম্ভ্রান্ত চেহারা। চোখদুটো অন্ধকারে জ্বলছে। হাত তিনেক দূরে বুককেসটার আড়ালে লুকিয়ে আছে। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার অনিলিখা বলে উঠল—হু আর ইউ? হাউ ডিড ইউ কাম ওভার হিয়ার? উত্তর এলো না। আবার বলতে গিয়ে থেমে গেল অনিলিখা।

কই? কেউ তো নেই। একটা গম্ভীর ছায়া শুধু যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে বুককেসটার পিছন দিকে। তাহলে কি এটা চোখের ভুল? এতো বড় ভুল, কী

করে সম্ভব? নিজের চোখকে কি এতোটা অবিশ্বাস করা সম্ভব!

ফায়ারপ্লেসের উপরে টর্চ রাখা ছিল। ওটা নিয়ে ফিরে এলো অনিলিখা। আলো ফেলল বুককেসটার পিছনের দিকে। কেউ নেই।

কাঠের উপরে নানান ধরনের ফুলের কাজ। দু'ধারে দুটো কাঠের পাল্লা দেওয়া খোপ। মনে হল মাঝের অংশটা পিছনের দিক দিয়ে খোলা যায় না। দোকান থেকে এক গোছা চাবি দিয়েছিল। তা দিয়ে খোলার চেষ্টা করল অনিলিখা। প্রথমে বাঁদিকটা খোলার চেষ্টা করল। বাঁদিকের খোপটাতে বেশ কয়েকটা দেরাজ। পুরো ফাঁকা। বুককেসের সামনের দিক থেকে এটা কারুর বোঝার উপায় নেই যে পিছনে এরকম আরেকটা জায়গা থাকতে পারে। খুব খেয়াল করলে তবে বোঝা যায়।

পিছনের ডানদিকের পাল্লাটা এবারে খোলার চেষ্টা করল অনিলিখা। কিন্তু কোনো চাবিতেই খুলতে পারল না। খানিক বাদে চেষ্টা ছেড়ে উঠে এলো। কিন্তু একটু দূরে গিয়ে আবার বুককেসটার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। ডানদিকের অংশের পাল্লাটা সামান্য খোলা। তাহলে কি ওরই মধ্যে কোনো চাবিতে খুলে গিয়েছিল পাল্লাটা? হয়তো। তখন হয়তো খেয়াল করেনি।

তবু কীরকম যেন গা ছমছম করে উঠল। মনের মধ্যে কেউ যেন বলছে, এখান থেকে দূরে চলে যেতে। এখন আর কিছু না-করতে। বাইরের কাচের জানলা দিয়ে রাস্তার আলো ঘরের কাঠের মেঝেতে এসে পড়েছে। তবে সে আলোর থেকে ছায়াই বেশি। আর সে-ছায়া যেন অনিলিখার চারদিকে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটা যেন শীতল উপস্থিতি ও টের পাচ্ছে। খুব কাছ থেকে। অনিলিখা নিজের মনে হেসে উঠল। এ নির্ঘাত গতকাল রাতে ভূতের সিনেমা দেখার ফল। আর তার সঙ্গে গত কয়েকদিন কাজের চাপে ঠিকঠাক ঘুমও হচ্ছে না। তবু টর্চের লাইটটা আবার বুককেসের পিছন দিকটায় ও ফেলল। এগিয়ে গেলো ডানদিকের অংশটার দিকে। টর্চটা কমজোরি। তার আলোতে পাল্লা খুললেও ভেতরে কী আছে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না।

ভেতরে কী আছে আন্দাজ করার জন্য হাতটা ভেতরের দিকে বাড়িয়ে দিল অনিলিখা। কিছু নেই। হঠাৎ ওর মনে হল যেন একটা অন্য হাতের স্পর্শ। ঠান্ডা। চমকে হাত বার করে নিল ও।

আবার নিচু হয়ে টর্চ দিয়ে ভালো করে ভেতরটা দেখে নিল। না কই, কিছুই তো নেই। একটু দ্বিধা নিয়ে আবার হাত ঢুকিয়ে দেখার চেষ্টা করল ভেতরে কী আছে। হঠাৎ ওর মনে হল দেরাজের বাঁদিকে যে কাঠটা আছে তার অনেক ভেতরের দিকে একটা ছোট কাঠের সুইচের মতো কিছু একটা আছে। সেটা একটু জোরে টেনে ধরতেই একটা বিকট আওয়াজে বুককেসের মাঝের অংশটা খুলে গেল। ওটা যে খোলা যাবে আগে বোঝা যায়নি। এখন খুলে গেছে। এমনিতে দেখে মনে হয় যেন একটা ফুলের স্তবক। এখন বুঝতে পারল ওটা একটা গোল মতো পাল্লা। সেটা আরেকটু টেনে পুরোটা খুলে ফেলল অনিলিখা। ভেতরে অনেকটা জায়গা। টর্চের আলোয় ভেতরটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা আছে। মাঝের এই অংশটা মাটি থেকে প্রায় চার ফুট অব্দি উঁচু।

চওড়াও ভালোই হবে। ভেতরে না-ঢুকে হাত ঢুকিয়ে খানিকটা হাতড়ানোর চেষ্টা করল অনিলিখা। মনে হচ্ছে যেন ভেতরে আরও বেশ খানিকটা জায়গা। হঠাৎ বইয়ের মতো কীসে যেন হাত লাগল ওর।

হাত বাড়িয়ে বার করে আনল অনিলিখা। একটা লাল রঙের কভারের ডায়েরি। বেশ পুরোনো। ভিতরের পাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে।

পাল্লা বন্ধ করে ডায়েরিটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে এলো অনিলিখা। পড়তে শুরু করল। যিনিই লিখে থাকুন না কেন হাতের লেখা বেশ ভালো। কিন্তু কোথাও কোনো নাম, ঠিকানার উল্লেখ নেই। সরাসরি লেখা শুরু হয়ে গেছে।

১৮ মার্চ ১৯৭১

ডায়েরি লেখার কোনোদিন অভ্যেস ছিল না। আজকে প্রথম লেখা শুরু করলাম। ক-দিন লেখার উৎসাহ থাকবে জানি না।

দু-সপ্তাহ হল আমরা এ বাড়িতে এসেছি। ডেভিড আর আমি দুজনে মিলেই পছন্দ করেছিলাম। অনেক পুরোনো দিনের বাড়ি। বাইরে অনেকটা খোলা জায়গা। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সুন্দর ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের বাগান। মাঝে বহুদিন এই বাড়িতে কেউ থাকত না। আসলে যার কাছ থেকে কিনেছি সেই লর্ড ডাডলে বেশিরভাগ সময় ওনার লন্ডনের বাসভবনে থাকতেন। আগে এখানে মাঝে মধ্যে আসতেন। কিন্তু একটা সময় একেবারেই আসা ছেড়ে দেন। তখনই ঠিক করেছিলেন বিক্রি করে দেবেন। কিন্তু চাইলেই তো আর বিক্রি

করে দেওয়া যায় না। এত বড় বাড়ি, এতটা খোলা জায়গা, লেক—পুরোটা মেনটেন করা মুখের কথা নয়। সব মিলিয়ে উনি যা-দাম প্রত্যাশা করছিলেন, তার কাছাকাছি কিছুই পাচ্ছিলেন না।

তা আমরা হঠাৎ এজেন্ট মারফৎ এই ম্যানসনের খোঁজ পেলাম। আমরা একটা বড় জায়গার উপরে একটা বাড়ি খুঁজছিলাম। শহরের একটু বাইরে নিরিবিলি পরিবেশে। তা এতোটা বড় না হলেও হত। এটা প্রায় একশো একর জায়গা জুড়ে। আর বাড়িটা পুরোনো ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের বাড়ি। আমাদের চিরকালই ইচ্ছে ছিল এরকম বাড়িতে থাকার। ডেভিড ইদানিং ব্যবসা থেকে ভালোই রোজগার করছে। তা এ বাড়ি শেষ পর্যন্ত সাধ্যের মধ্যেই পেয়ে গেলাম। শুধু বাড়ি নয়, তার সঙ্গে পুরোনো দিনের আসবাব। লর্ড ডাডলের পক্ষে এতো বড়-বড় আসবাব লন্ডনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই বাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে পুরোনো দিনের সুন্দর আসবাবগুলোও আমাদের হয়ে গেল। তবে তার মধ্যে আমার সব থেকে পছন্দ একটা মেহগনি কাঠের বিশাল বুককেস। এতো সুন্দর কাঠের কাজ করা বুককেস পুরো ইংল্যান্ডে ক-টা আছে সন্দেহ। আমার মন বলছে এই বুককেসের সঙ্গে অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

শুধু সুন্দর নয়। একটা অন্যরকম আবেদন আছে বুককেসটার। কিন্তু তা বলে বোঝানো শক্ত। হিউ-এরও এটা খুব পছন্দ। ওর বয়েস এবারে নয় হল। আমাদের একমাত্র ছেলে।

ভারী দুষ্টু। শুধু ডেভিড যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ একটু চুপচাপ থাকে। যেই বেরোয়, সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে আসল রূপ ফিরে পায়। একবার টেবিলের উপরে উঠছে, তো একবার সিঁড়ির রেলিং বেয়ে উপরে উঠে আবার স্লিপের মতো করে উপর থেকে নীচে নেমে আসছে। একমুহূর্ত চুপ করে বসবে না।

আজকে সকালবেলায় অনেকক্ষণ ওকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বাড়ি ভালো করে দেখলাম। বাগানেও খুঁজে এলাম। বাড়ির কাজের লোক হ্যারিকেও খুঁজতে পাঠালাম। তা সেও না পেয়ে ফিরে এলো। খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি, এমন সময় হঠাৎ ওর গলা শুনতে পেলাম। তার পরে দেখি লাইব্রেরির ওই বুককেসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাসি হাসি মুখ।

এখন সন্ধে সাতটা, বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি আর হাওয়া শুরু হয়েছে। জানলার উপরে বৃষ্টির ফোঁটা তুলির টান। খুব ভালো লাগে যখন এখানে জোরে

বৃষ্টি হয়। তবে আজকে যেন বেশি জোরে আওয়াজটা হচ্ছে। হয়তো শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বাড়ি ঘিরে একটা উৎসব শুরু হয়েছে। আসলে এ বাড়ির একটা বড় অংশ জুড়ে কাচের জানলা। এই বৃষ্টির শব্দে এখন আর তাই এখানে একা লাগছে না। মনে হচ্ছে অনেক সঙ্গী পেয়ে গেছি।

বাইরে বেল বেজে উঠল। টেরি ডাকছে। আনন্দের ডাক। মনে হয় ডেভিড ফিরেছে। আজকে এটুকু থাক।

২৫ মার্চ ১৯৭১ বিকেল ৬টা

যতোই ভাবি রোজ ডায়েরি লিখব, আর লেখা হয়ে ওঠে না। আসলে এর মাঝে আমি একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াতে শুরু করেছি। মূলত সময় কাটানোর জন্য। এখন ডেভিডও এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে কথা বলার আর লোক পাই না। কিন্তু পড়াতে গিয়ে যে এতোটা সময় চলে যাবে, তা আগে বুঝতে পারিনি। হয়তো খানিকটা ধাতস্থ হয়ে গেলে আর সেটা হবে না।

কালকে যে ঘটনাটা ঘটে গেল তার রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। পড়ে গিয়ে এখনও সারা গায়ে ব্যথা। গত কয়েকদিন একটা অদ্ভুত জিনিস আমার চোখে পড়েছে। কালকেও তাই লক্ষ করলাম। বিকেলের দিকে জানলা দিয়ে দেখি হিউ বাগানের মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। ছোটার সময় এমনভাবে মাঝে-মধ্যে পিছনের দিকে তাকাচ্ছে আর হাসছে, মনে হচ্ছে যেন কেউ ওর পিছনেই তাড়া করেছে। আমি মিনিট পাঁচেক দেখলাম। ঠিক যেমন দুটো বাচ্চা নিজেদের মধ্যে ছুটোছুটি করে খেললে হয়, সেরকম। আমি যেন শুধু অন্যজনকে দেখতে পাচ্ছি না। ভাবলাম চোখের ভুল। ভালো করে দেখার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। ওরা খেলছিল পিছনের বাগানের দিকটাতে। সে দিকের দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে অবাক হলাম। দরজা কিছুতেই খুলছে না। পুরোনো দিনের ভারী কাঠের দরজা। কিন্তু না-খোলার কিছু নেই। এ কয়েকদিনে বেশ কয়েকবার ওই দিক দিয়ে বাইরে গেছি। যাই হোক, অন্য দিক দিয়ে ঘুরে গেলাম। পৌঁছে দেখি হিউ তখন আর ছোটাছুটি করছে না। ঘাসের উপরে চুপ করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করলাম কেউ ওর সঙ্গে খেলতে এসেছিল কিনা। ও ঘাড় নাড়ল। না। কেউ না। চারদিক দেখলাম। সত্যি কেউ নেই। বাইরে যাওয়ার কোনো রাস্তাও নেই ওদিক দিয়ে। আর তাছাড়া কাছেপিঠে কোনো বাড়িও নেই। তাহলে হয়তো চোখের ভুলই হবে। তখনকার মতো আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। খানিকক্ষণ হিউ-এর সঙ্গে বাগানে কাটিয়ে ঘরে ঢুকে এলাম।

ওর পড়ার আর খেলাধুলো করার ঘরটা একতলায়। লাইব্রেরির আর আমাদের টি-রুমের মাঝের ঘর। রাত আটটা নাগাদ ওর ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাইরে থেকে ওর গলার আওয়াজ পেলাম। ঘরের দরজা-ভেজানো। কারুর সঙ্গে ও কথা বলছে। দাঁড়িয়ে গেলাম। বাইরে থেকে শোনার চেষ্টা করলাম। ওর গলা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে যেই থাকুক না কেন, তার গলা শোনা যাচ্ছে না।

কে হতে পারে? দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম। হিউ টেবিলে বসে আছে। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। সামনে একটা কমিক্সের বই খোলা। আশ্চর্য ব্যাপার। ঘরে আর কেউ নেই। আমি ওর উলটোদিকের চেয়ারে এসে বসলাম। কেন জানি না ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল কেউ ছিল, এই এক্ষুনি ছিল। কিন্তু আমার সামনে ও কিছুতেই সেটা স্বীকার করল না। লক্ষ করলাম ঘরে হিটার চলা সত্ত্বেও কীরকম যেন ঠান্ডা-ঠান্ডা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব। ঘরের উষ্ণতা বাড়ানোর জন্য হিটার অ্যাডজাস্ট করতে যাব, এর মধ্যে হঠাৎ টেবিল ল্যাম্পের আলো নিভে গেল। পাওয়ার কাট। খানিকক্ষণের জন্য পুরো অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম। তারপরে আস্তে আস্তে চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এলো। বাইরে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ উঁকি মারছে। আর সেই ধার করা আলো জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। একরাশ কুয়াশা যেন ঘরের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে আর চাঁদের আলো সারা গায়ে মেখে রঙিন হয়ে উঠেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে হিউয়ের দিকে তাকাতে গিয়ে হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। ও আর একা নেই। ওর পাশের চেয়ারে ওর থেকে বয়সে সামান্য বড় একটা ছেলে। সম্ভ্রান্ত চেহারার। সোনালি চুল। গায়ে ঢিলে সাদা পোশাক। চোখ দুটো জ্বলছে আর আমার দিকে একটু বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে আছে। আমি চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। উঠে দাঁড়িয়ে হিউ-এর দিকে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ করে টেবিলের নীচের দিকের কাঠের অংশে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। ফের চোখে অন্ধকার নেমে এলো।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন আমি উপরের শোওয়ার ঘরে। আমাকে ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে ডেভিডও আছে। শুনলাম আমি নাকি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। আর কারেন্ট নাকি কখনও যায়নি। শুনে খুব অবাক লাগল। তাহলে বাকিটা সবই কি স্বপ্ন?

৮ এপ্রিল ১৯৭১ সকাল সাতটা

হয়তো কোনো একটা সময় আসবে যখন এই লেখা কারুর হাতে পৌঁছবে। কালিতে লেখা এই শব্দগুলো এতো সহজে হারাবে না। ডেভিড এখনও আমার

কথায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমি নিশ্চিত, এ বাড়িতে আরেকটা বাচ্চা আছে। সে জীবিত না মৃত, তা জানি না। সে আমাদের ভালো চায়, না খারাপ চায় তাও জানি না। তবে সে ঘরের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে থাকে। আর একই সঙ্গে আমার মনে হয়, ওই বুককেসটার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ আছে। হিউকে সে এতোটাই বশ করে ফেলেছে, যে হিউ আমাদেরকেও ওর কথা বলে না। এতোটাই হিউ-এর উপরে ওর প্রভাব।

বাড়ির কাজের যে মেয়েটা আছে ভিকি বলে, সেও একদিন হিউকে একা বসে থাকা অবস্থায় কারুর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। আশেপাশে কাউকে খুঁজে পায়নি।

আমিও আজকাল অনেক সময় যেন কমবয়সী কোনো ছেলের কথা শুনতে পাই। অস্পষ্ট-দুর্বোধ্য কথা। যেন হাওয়ায় ভেসে আসা ঠিক মতো টিউন না-করা রেডিওর চ্যানেলের মতো।

এবারে গত পরশুর ঘটনাটায় আসি। সন্ধে সাতটা হবে। ছুটির দিন। আমি আমার অফিস রুমে বসে একটা গল্পের বই পড়ছি, হঠাৎ টেরির চিৎকার শুনলাম। টেরি আমাদের পোষা কুকুর। ল্যাব্রাডর। চার বছর বয়েস। আগে সারাক্ষণ লাফালাফি করে বেড়াত। এখন বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক শান্ত হয়ে গেছে। তাই ওর ওভাবে ডাকাটা খুব স্বাভাবিক নয়। আর আওয়াজটা আসছে নীচের লাইব্রেরির দিক থেকে। বই বন্ধ করে নীচে নামলাম। টেরি একটানা ডেকেই চলেছে।

লাইব্রেরিতে দুটো দিক দিয়ে ঢোকা যায়। এক, হিউ-এর পড়ার ঘরের দিক দিয়ে। দুই, ড্রয়িং রুমের মধ্যে দিয়ে। আরও অন্য কয়েকটা ঘরের মধ্যে দিয়ে সেক্ষেত্রে যেতে হয়। সেদিক দিয়েই জোর পায়ে এগিয়ে গেলাম। টেরির আওয়াজ শুনে আমাদের রান্না করে যে লোকটা, সেই স্যামুয়েলও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আর আমার আগে-আগে এগিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ টেরির চিৎকারটা বদলে গেল। একটা ভয়ানক চিৎকার। তারপর একটু গোঙানি। তারপরে সব শান্ত। আমরা অন্য ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রায় ছুটতে শুরু করেছি। লাইব্রেরির মধ্যে যখন ঢুকলাম, তখন সব একদম চুপচাপ। কোনো শব্দ নেই। ঘরে আলো জ্বলছে না। এই ঘরে জানলা কম। আর সেই তুলনায় ঘরটা বিশাল লম্বা, বড়। দু'ধার দিয়ে সাজানো বুককেস। বেশির ভাগই অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরোনো। তাই ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার। ভালো করে

কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আরেকটু এগিয়ে যেতেই সামনের দৃশ্য দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। লাইব্রেরির মাঝামাঝি যে বিশাল বুককেসটা আছে, তার সামনে টেরি পড়ে আছে। আর তার খানিকটা দূরে মাটিতে বসে হিউ। মনে হল ভয়ে কাঁপছে।

স্যামুয়েল আর আমি টেরির অবস্থা পরীক্ষা করলাম। প্রাণ নেই।

আমি জানি হিউ-এর পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। ও টেরিকে যথেষ্ট ভালোবাসে। আর ওর গায়েও এতো জোর নেই। কিন্তু ঘরে আর কেউ নেই। তাই আর কারুর পক্ষে করা সম্ভবও নয়।

চিৎকার করে ধমকে উঠলাম—কী করেছ হিউ? ও কি তোমাকে আক্রমণ করেছিল?

ও কাঁদতে-কাঁদতে বলে উঠল—ও এডওয়ার্ডকে অ্যাটাক করেছিল। এডওয়ার্ডই ওকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। আমি কিছু করিনি।—বলে ও ফের কাঁদতে থাকল।

—কে? কে এডওয়ার্ড?

হিউ খানিকক্ষণ উত্তর দিল না। তারপরে বলে উঠল—আমার বন্ধু। এখানে থাকে ও।—বলে পাশের বুককেসটার দিকে দেখাল।

যেটার দিকে দেখাল, সেটা লাইব্রেরির সবথেকে পুরোনো ও সবথেকে সুন্দর বুককেস। যার কথা আগেই বলেছি। ততক্ষণে আমার বাড়ির অন্য কর্মচারীদের মধ্যে বাটলার, ফুটম্যান ও আরও বেশ কয়েকজন ঘরে ঢুকে পড়েছে। স্যামুয়েল ওই বুককেসটা ভালো করে খুঁজে দেখল। কেউ কোথাও নেই। কোথায় এডওয়ার্ড? প্রায় দেড় ঘণ্টা পুরো ঘরটার চিরুনি তল্লাশি হল। কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ডেভিড আমাকে পরে বলেছিল, বাচ্চাদের মধ্যে এরকম যখন অপরাধবোধ হয়, তখন তারা নাকি অন্য কারুর উপরে দোষ চাপায়। আর খুব বিপদে পড়লে আত্মরক্ষার জন্য সবাই অনেক কিছুই করতে পারে। ওর ধারণা হিউকে যে কোনো কারণেই হোক না কেন টেরি আক্রমণ করেছিল। আর তাই আত্মরক্ষার জন্যই এটা হিউ করেছে। আমি কিন্তু জানি হিউ যা বলেছিল, সব ঠিকই বলেছিল। ওর গায়ে

কোথাও কোনো আঁচড়েরও দাগ নেই। একটা কুকুর তা যতই পোষা হোক না কেন, এরকম সময়ে একবারও আঁচড়াবে না! বিশেষ করে যখন তাকে আক্রমণ করা হয়েছে! ওকে আলাদা করে পরে ডাকলাম। বারবার জিজ্ঞেস করলাম। হিউ কিন্তু আর কোনো কথা বলল না। প্রশ্নটা হল কে এই এডওয়ার্ড? কোথায় সে থাকে? আর সে কী চায়? তার আসল লক্ষ্য কে? হিউ নাকি অন্য কেউ? না, যে করেই হোক না কেন হিউকে রক্ষা করতেই হবে।

ডায়েরি পড়ায় বাধা এলো। একটা খুব অস্পষ্ট আওয়াজ যেন শোনা যাচ্ছে। রিচার্ড, রিচার্ড। —একটা বাচ্চার গলা। যেন কান্নায় ভেজা কণ্ঠস্বর।

অবাক হয়ে ডায়েরিটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল অনিলিখা। কোত্থেকে আসছে আওয়াজটা? খানিকক্ষণের জন্য শব্দটা থেমে গেল। আবার খানিক বাদে আওয়াজটা শুরু হল। যেন কেউ মনের গভীরে সরাসরি শব্দটা পৌঁছে দিচ্ছে। আবার সে কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হয়ে গেল। এ যেন টিভিতে চ্যানেল না-এলে যেরকম শব্দ হয়, সেরকম। একটা অস্পষ্ট আওয়াজ।

কিন্তু মাঝে-মধ্যে সে আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে—রিচার্ড, রিচার্ড। এ যেন কারোর আর্তচিৎকার। ইংল্যান্ডের বেশির ভাগ বাড়িতে আলোর তীব্রতা কম থাকে। সিলিং-এর আলোতে চারদিক স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু তা সত্ত্বেও এটুকু নিশ্চিত যে এই ঘরের মধ্যে থেকে আওয়াজটা আসছে না। আস্তে আস্তে ড্রয়িং রুমের দিকে এগিয়ে গেল অনিলিখা। ওদিক দিয়েই এসেছিল শব্দটা। কিন্তু দরজাটা ভেজানো। ড্রয়িং রুমের দরজাটা টেনে খোলার চেষ্টা করল অনিলিখা। কিন্তু মনে হল অন্যদিক দিয়ে কেউ যেন টেনে ধরে রেখেছে। বেশ খানিকটা জোর দিতে হ্যান্ডেলটা অবশেষে ঘুরল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল অনিলিখা। ঘরের আলোর সুইচটা হাতড়ে জ্বালাল। পুরো ঘরটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা দিকে টিভি, সোফাসেট। ড্রয়িং রুমের দু-দিকে জানলা। একটা দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে বুককেসটা। এতো বড় ড্রয়িং রুমটাকেও ওই দৈত্যাকার বুককেসটার জন্য ছোট লাগছে। বুককেসটা আর দেওয়ালের মাঝে দু-ফুট মতো জায়গা। আস্তে আস্তে অনিলিখা এগিয়ে গেল ওই দিকটায়। ওখান থেকেই যেন আওয়াজটা আসছে। বাইরে থেকে আসা রাস্তার ল্যাম্পের আলোয় আলোছায়ার বিচিত্র নক্সা তৈরি হয়েছে কাঠের মেঝেতে। হাতের তালুর উষ্ণতাও নিজেই টের পেল, কমে এসেছে। ওই ডায়েরি পড়ার আর গত কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। হঠাৎ কী মনে হতে আর না এগিয়ে ফিরে এলো জানলার কাছে। আগেরবারে টর্চটা জানলার কাছে রেখে গিয়েছিল। ওটা

নিতে গিয়ে বাইরের দিকে লক্ষ করল। বাইরের রাস্তা এখন জনশূন্য। রাত এখন দশটা। শুধু রাস্তার উলটো দিকের বাড়িটাই কাছাকাছির মধ্যে একমাত্র বাড়ি। সে বাড়িটারও সব আলো নিভে গেছে। স্বাভাবিক। কেউ এখানে অফিসের দিনে এতো রাত করে না। শুধু একটা কালো বেড়াল রাস্তা পার হয়ে এদিকে চলে এলো। তার পরে বাড়ির সামনের ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলে গেল। যাওয়ার আগে একবার শুধু হলদেটে চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল অনিলিখার দিকে।

এ পাড়াটা এরকমই। উচ্চবিত্ত পাড়া। কেউ কারুর খবর রাখে না। লোকজনও খুব কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও একমাসে বেশ ভালো লেগে গেছে অনিলিখার। ভারী নিরিবিলি পরিবেশ। লোকজনও বেশ ভদ্র।

এবারে আস্তে আস্তে অনিলিখা টর্চ নিয়ে এগিয়ে গেল বুককেসটার দিকে। কেউ নেই। বুককেসের পিছনেও কেউ নেই। বুককেস আর দেওয়ালের মাঝের জায়গাটায় চলে এলো ও। তারপরে নিচু হয়ে মাঝের অংশটা খুলে টর্চের আলো ফেলল। না, ভেতরটা যদ্দূর দেখা যাচ্ছে, কেউ নেই। তবে কি ওই আওয়াজটাই মনের ভুল!

ভালো করে খানিকক্ষণ দেখে সোফায় এসে বসল অনিলিখা। খানিকটা অন্যমনস্কভাবে টিভির রিমোটের সুইচটা দিতেই একই সঙ্গে ঘরের আলোটা কেঁপে উঠে নিভে গেল। ফের নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে অন্ধকারে ডুব দিল পুরো ঘর। এবারে যেন সত্যিই ভয় পেয়ে গেল অনিলিখা। সেই বাচ্চাটার গলায় একটা তীব্র কান্নাভেজা আর্তচিৎকার ফের যেন মনের মধ্যে শোনা গেল—রিচার্ড, রিচার্ড। চমকে সোফা ছেড়ে উঠে টর্চটা খুঁজতে চারদিক হাতড়াতে শুরু করল অনিলিখা। ওটা বসার সময় কোথায় রেখেছে খেয়াল হল না। অন্ধকারে চোখ খানিকটা সয়ে এসেছে। আর তাই চারদিকে কী আছে তার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আওয়াজটা যেন আর বুককেস নয়, খুব কাছ থেকেই আসছে। সেটা দেখতে গিয়ে অনিলিখা হঠাৎ খেয়াল করল ও যেখানে বসে ছিল, ঠিক সেখানেই ঠিক তার পাশের সোফায় কেউ যেন বসে আছে। অন্ধকারে শুধু চোখদুটো দেখা যাচ্ছে। সে চোখদুটো যেন অন্ধকারেও জ্বলছে। যেই ওখানে বসে থাকুক, তার তীব্র দৃষ্টি অনিলিখার উপরে। আর সে দৃষ্টি মানুষের নয়।

ঠিক এই সময়ে টর্চে হাত লাগল অনিলিখার। কোনোরকমে সাহস সঞ্চয় করে

ওটা পাশে বসা ওই ছায়ার মুখের উপরে ফেলল। মুহূর্তে যেন সে ছায়া মিলিয়ে গেল। কই, কোথাও কেউ নেই। সব আবার ফাঁকা। কোনোরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অনিলিখা।

পিছনে ড্রয়িং রুমের দরজা যেন আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

মরগ্যান কোর্ট

ওয়ারচেস্টারে ইংল্যান্ড আর ওয়েলেসের সীমান্তে অবস্থিত এই ছোট শহর মরগ্যান। ইংল্যান্ডের মধ্যে হলেও শহরের নামটা শুনেই যে কেউ বলে দেবে যে এটা ওয়েলস নাম। আসলে এক নামকরা ধনী মরগ্যান পরিবারের নাম অনুযায়ী এই শহরের নামকরণ হয়েছিল একসময়। আর যে বিখ্যাত বাড়ির জন্য এ শহরকে সবাই চেনে, সেই মরগ্যান কোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে অনিলিখার প্রথমেই মনে হল যেন চারশো বছর আগে পৌঁছে গেছে। একটা সরু দুই লেনের গাড়ির রাস্তার থেকে বাড়িতে ঢোকার প্রাইভেট রাস্তা। রাস্তাটা এগিয়ে গেছে একটা বড় পুকুরের পাশ দিয়ে। পুকুরের ধার দিয়ে পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেশ খানিকটা এগোনোর পর একটা গেট পড়ল। এখানে সিকিউরিটি আছে। গেটের কাছে গাড়ি পার্ক করে সিকিউরিটির দিকে এগিয়ে গেল অনিলিখা। ও আগেই ফোন করে জানিয়েছিল যে আজকে ও এখানে আসবে। অ্যান্টিক হাউস থেকে বুককেসের পূর্ববর্তী মালিকের নাম, ফোন নাম্বার, ঠিকানা জোগাড় করার পর ফোন করেছিল। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর শেষে ডেভিডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিল। এমনিতে ডেভিড দেখা করতে চাইছিলেন না। বুককেসের কথা বলার পরে রাজি হয়েছেন। তা সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ীই অনিলিখা এখানে এসেছে। গেট পেরোনোর পরে লাল নুড়িপাথর ফেলা রাস্তা একটা বিশাল থামওয়ালা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। এতো বড় বাড়ি যে বাইরে থেকেই দেখে হকচকিয়ে যেতে হয়। বাড়ির বাইরে ভারী সুন্দর ভিকটোরিয়ান গার্ডেন। ঠিক সামনেই সারি দিয়ে ভারী সুন্দর চেরি ব্লসম গাছ, সাদা থোকা-থোকা ফুলে সেজে উঠেছে। বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে বাগানের মধ্যে থেকে। সিঁড়ি শেষ হয়েছে একটা বড়ো চত্বরে। আর তার মধ্যে দিয়ে বাড়িতে ঢোকার বিশাল কাঠের দরজা। অবশ্য বাড়ি বলাটাই ভুল, এককথায় প্যালেস। মধ্যযুগীয় গথিক স্থাপত্য। বাইরের বেলেপাথরের দেওয়াল বেয়ে কিছু কিছু জায়গায় লতানে গাছ উপর অব্দি উঠে গেছে। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে বিশাল-বিশাল

স্টেনগ্লাসের জানলা। সিকিউরিটি বাড়ির ভেতর অব্দি পৌঁছে দিয়ে গেল। একটা চওড়া প্যাসেজ, ভারী সুন্দর ভল্টেড সিলিং পেরিয়ে একটা বেশ বড়ো ড্রয়িং রুমে এসে বসল অনিলিখা। মিনিট পাঁচেক বসার পরে ডেভিডের দেখা মিলল। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা। বয়স আশির কাছে হবে। কিন্তু সে তুলনায় দেখে অনেক সুস্থ বলে মনে হয়। দেখেই বোঝা যায় একসময় বেশ সুন্দর দেখতে ছিলেন। মাথা ভর্তি চুল। চশমা না-পরে থাকলেও চোখের নীচে সামান্য বসে যাওয়া প্রমাণ করে ভদ্রলোক নিয়মিত চশমা পরেন।

ঘরের মাঝখানে বিশাল ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি, ফ্রেঞ্চ রকোকো স্টাইলের কাজ-করা চেয়ার, মার্বেলের ফায়ারপ্লেসের উপরের দেওয়ালে বিশাল কাঠের কাজ-করা আয়না, দেওয়ালে রুবিনের আঁকা ছবি প্রমাণ করে যে এখনও এই বাড়ির মালিক যথেষ্ট অবস্থাপন্ন।

ওনার সঙ্গে-সঙ্গেই একজন সুসজ্জিত বাটলার ঘরে এসে ঢুকল। সাজানো টি-পটে চা দিয়ে গেল।

—তা বলুন কী জানতে চান।—সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন ডেভিড।

—আমি ওই বুককেসটার কথা জানতে চাইছিলাম। ওর ইতিহাস। ওটা তো আপনারাই ওই অ্যান্টিক শপে দিয়েছিলেন। আমি সবে দু-দিন হল কিনেছি। কিন্তু গত দু-দিনে একটা ভারী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। তা সে জন্যই জানতে চাই।

—কীরকম অভিজ্ঞতা? একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে কি?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তা—আপনি জানলেন কী করে?

—আমার পক্ষে এবিষয়ে কিছুই বলা সম্ভব হবে না। আমি নিজে কখনই দেখিনি। তবে আমার স্ত্রী মেরি এ বিষয়ে মাঝে-মধ্যে বলত। আমি ওর কথা প্রথমে বিশ্বাস করতাম না। পরে কেন জানি না মনে হত হয়তো সত্যি হলেও হতে পারে।

—ওনার সঙ্গে দেখা করা যাবে কি?

একটু চুপ করে থাকলেন ডেভিড, তারপরে বলে উঠলেন—ও তো আজ থেকে প্রায় বত্রিশ বছর আগে মারা গেছে।

—আর আপনার ছেলে?

—আপনি বোধহয় হিউ-এর কথা বলছেন। তাই তো? —ভদ্রলোক অনিলিখার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে তারপরে মুখ নিচু করে টি-পট থেকে চা ঢাললেন। মুখে একটা বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠল।

একটু থেমে ফের বলে উঠলেন—হিউ হারিয়ে যায়। ওর বয়েস যখন নয়, সেই সময় ও হঠাৎ করে একদিন হারিয়ে যায়। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি। কিন্তু আর পাওয়া যায়নি। আর সে জন্যই মেরি তারপর থেকে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে।—ভদ্রলোক থামলেন। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

—আচ্ছা, আপনার ছেলের কি অন্য কোনো নাম ছিল, রিচার্ড বা সেরকম কিছু?

—না, সেরকম তো কিছু ছিল না। আপনি আমার ছেলের কথা জানলেন কী করে?

—একটা ডায়েরি থেকে। খুব সম্ভবত আপনার স্ত্রী মেরির লেখা।—বলে অনিলিখা ব্যাগ থেকে ডায়েরিটা বার করে দেয়।

ভদ্রলোকের মুখ যেন কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে ওঠে। উনি উঠে দাঁড়িয়ে অনিলিখার হাত থেকে ডায়েরিটা নিয়ে নিলেন।

তারপর অবাক হয়ে বলে উঠলেন—কোথায় পেলেন? আমি মেরি চলে যাওয়ার পরে বহুদিন খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি। —বলে সস্নেহে হাত বোলালেন ডায়েরির উপরে। আস্তে আস্তে বলে উঠলেন—ও অনেক সময় লিখত এ ডায়েরিতে। হিউ হারিয়ে যাওয়ার পরপরই ও অবশ্য খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি ওকে আর তারপরে লিখতে দেখিনি। তা আপনি কি পুরো ডায়েরিটা পড়েছেন?

অনিলিখা একটু লজ্জায় পড়ে গেল। সত্যি বলতে কী পড়াটা উচিত হয়নি। বলে উঠল—আসলে আমার হয়তো পড়াটা উচিত ছিল না। তবে না-পড়লে এ-ঘটনাটাও জানতে পারতাম না। শুরুর দিকের খানিকটা পড়েছি। পুরোটা এখনও পড়া হয়নি। এটা ওই বুককেসের একটা লুকোনো দেরাজে ছিল। আর ওটা পড়েই বুঝতে পারি যে ওই বুককেস বা এ বাড়ির মধ্যে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। আর তাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি।

ডেভিড অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপরে হয়তো নিজের অনুভূতি অনিলিখার থেকে লুকোনোর জন্যই ওর দিকে না তাকিয়ে বলে ওঠেন—আমি আর ক-দিন আছি জানি না। সারাজীবন অনেক অর্থ উপার্জন করেছি। কিন্তু

কখনই সুখী হতে পারিনি। আর তার মূলে আছে এ বাড়িতে আমাদের আসা। আমাদের এখানে আসা একেবারেই ঠিক হয়নি। কত আনন্দে ছিলাম। কিন্তু এখানে আসার পর থেকেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে শুরু হল। লর্ড ডাডলেও তাই হয়তো এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আর পরে বিক্রি করে দেন। কিন্তু কেনার সময় আমাদের তো আর সেকথা জানা ছিল না।

—তা লর্ড ডাডলেরা কি অনেকদিন ছিলেন এখানে?

—হ্যাঁ, ওনারা প্রায় পাঁচ-ছ' প্রজন্ম ছিলেন। ওনাদের অনেক কয়লা খনি, পোর্ট ইত্যাদি ছিল। তার আগে এখানে ছিলেন মরগ্যানরা। মরগ্যানরা এখানে প্রায় ১৫০০ সাল থেকে ছিলেন। এখানকার বেশ কিছু ফার্নিচার ওই সময়ের। খুব সম্ভবত ওই বুককেসটাও। পুরো ইংল্যান্ডে ওদের মতো ধনী ওইসময় খুব কম ছিল। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের সঙ্গেও ওদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। শুনেছি রানি প্রথম এলিজাবেথও ১৫৮০ সালে এখানে এসে ওনাদের অতিথি হিসেবে ছিলেন বেশ কিছুদিন। তবে একটা এ ধরনের বাড়ি তো আর পাঁচশো বছর ধরে একই রকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এর ক্ষেত্রেও তাই। অনেকবার ভাঙচুর মেরামত করা হয়েছে। আমি নিজেও বেশ কিছু পরিবর্তন করেছি।

—তাহলে তো এ বাড়ি একদম ঐতিহাসিক।

—হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে এ বাড়ির একটা অংশ এখন কিন্তু আপনার কাছে। এই বুককেস। ওটা খুব সম্ভবত ১৫০০ সালের দিকে তৈরি।

—আচ্ছা, আপনি কখনও কোনো অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছেন ওই বুককেসটা নিয়ে?

এবারে যেন একটু অধৈর্য হয়ে পড়লেন ডেভিড। বলে উঠলেন—আগেই তো বলেছি, এ ব্যাপারে আমি নিজে কিছু জানি না। এমনিতেও হিউ আর মেরি চলে যাওয়ার পরে আমি এ বাড়িতে কমই থাকতাম। আর ওই বুককেসটাকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমার আউটহাউসে। ওটাকে সহ্য করতে পারতাম না। এর বেশি আর কিছুই বলার নেই।

বলে উঠে দাঁড়ালেন ডেভিড।

অনিলিখাও বুঝতে পারল যে কারণেই হোক না কেন ডেভিড আর কিছু বলতে চান না। ও বেরোনোর জন্য উঠে পড়ল।

ফোনটা বেশ খানিকক্ষণ ধরেই বাজছিল। কিন্তু গাড়ি চালাচ্ছিল বলে ফোন

ধরছিল না অনিলিখা। শেষে মোটরওয়ের ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফোন ধরল। ধরেই বুঝতে পারল উলটোদিকে গ্যারির গলা। আমেরিকায় থাকে। খুব নামকরা ফরেনসিক এক্সপার্ট। বিভিন্ন ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশনে যায়। ওর সঙ্গে অনিলিখার বহুদিনের আলাপ। তবে নাম্বারটা লোকাল নাম্বার। অর্থাৎ ও এখন এখানেই।

—ইংল্যান্ডে কবে এলে? কতদিনের প্ল্যান?

অন্যদিক দিয়ে উত্তর এলো—এই এক সপ্তাহ হল। আরও একমাস মতো থাকব। তবে তার পরেও বেশ কয়েকবার হয়তো যাতায়াত করতে হবে।

—তা এবারের কেসটা কী? নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কেস হবে।

একটু চুপ করে থাকল গ্যারি। তারপরে যেন একটু দোনামনা করেই বলে উঠল—হ্যাঁ, এবারে এটা সত্যিই খুব ইন্টারেস্টিং কাজ। তাছাড়া এর কেন্দ্রে আবার ইংল্যান্ডেরই রাজপরিবার।

একটু থেমে গ্যারি ফের বলে উঠল—প্রিন্সেস ইন দ্য টাওয়ারের কথা শুনেছো?

—হ্যাঁ, শুনেছি টাওয়ার অফ লন্ডন থেকে টিউডর ফ্যামিলির দুই যুবরাজ হারিয়ে যায়। কী হয়েছিল জানা যায়নি। তবে তার বহু বছর পরে তাদের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যায় ওই টাওয়ার অফ লন্ডনেই। তাই তো?

—একজাক্টলি। ১৪৮৩ সালের অক্টোবর মাসে ওই দুই যুবরাজ টাওয়ার অফ লন্ডন থেকে হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়ার আগে অব্দি টাওয়ার অফ লন্ডনেই তারা বন্দী ছিল। এই হারিয়ে যাওয়ার পিছনে সন্দেহ করা হয় ওদের কাকাকে। ওদের সেই কাকা তৃতীয় রিচার্ড কখনই চায়নি যে ওরা রিচার্ডের রাজা হয়ে ওঠার পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াক। কারণ বড় রাজপুত্রই ছিল রাজসিংহাসনের আসল দাবিদার। ওদের সঙ্গে ঠিক কী হয়েছিল তা কেউ জানে না। কোনো তথ্য প্রমাণও তখন পাওয়া যায়নি। এর প্রায় দুশো বছর বাদে ১৬৭৪ সালে ওখানকার হোয়াইট টাওয়ারের একটা সিঁড়ির গোড়ায় মাটির প্রায় দশ ফুট নীচে দুজনের কঙ্কাল পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেওয়া হয় যে এরাই ছিল ওই দুই রাজপুত্র। তার আবার বহু বছর পরে ১৯৩৩ সালে ওই দুই কঙ্কালের উপরে ফরেনসিকসও করা হয়, যাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ওই দুই কঙ্কাল ওই দুই রাজপুত্রেরই। আর তা

প্রমাণিতও হয়।

—কীরকম?

—দাঁতের গড়ন দেখে বোঝা যায় একজনের বয়স বারো বছর ন-মাস থেকে সাড়ে চোদ্দ বছরের মধ্যে ছিল। বড় রাজপুত্রর বয়স ওই হারিয়ে যাওয়ার সময় ছিল তেরোর কাছাকাছি। অর্থাৎ বয়স মিলে যায়। তাছাড়া জানা গিয়েছিল বড় রাজপুত্রের দাঁতের গঠনে একটা বিশেষ ধরনের অসুবিধে ছিল। একধরনের জেনেটিক রোগ। দেখা যায় দাঁতের উপরের পাটির দু'দিকের দ্বিতীয় প্রিমোলারের দুটো দাঁতই নেই। ওর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া লেডি অ্যান মাউব্রের দাঁতেও ঠিক একই অসুবিধে ছিল। ইতিহাসে তা লেখাও আছে। অর্থাৎ আরেকটা বড় সূত্র। আন্দাজ করা হয় অন্য কঙ্কালটা ছোট রাজপুত্রের। তাই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে ওরাই ছিল সেই দুই প্রিন্সেস অফ দ্য টাওয়ার। ইতিহাসের একটা বিশাল রহস্যের সমাধান হয়ে যায়।

—বাহ, বেশ অনেক কিছু জানলাম তো। তা তোমাকে তাহলে এ ব্যাপারে ডেকে আনার কি দরকার পড়ল?

—হ্যাঁ, সেটাই তো। আসলে ফরেনসিক সায়েন্সের বেশ কিছু নিয়ম থাকে। ১৯৩৩-এ যখন এ-বিষয়ে তদন্ত হয়, তখন এক্ষেত্রে সে নিয়মগুলো মানা হয়নি।

—কীরকম?

—এই যেমন ধরো, আগে থেকেই কোনো কিছু ধরে নিতে নেই। এখানে যেভাবে তদন্ত চালানো হয়েছিল তাতে শুরু থেকেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ওই দুই কঙ্কাল দুই রাজপুত্রেরই ছিল। আর তদন্তে সেটাকেই সত্যি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

—তা তোমার কী ধারণা? ওটা ওদের ছিল না?

—না, আমি তাও বলব না। সেটা আরও তদন্তসাপেক্ষ। একদিকে সেটার পক্ষেও যেমন অনেক জোরালো যুক্তি আছে, তার বিপক্ষেও কিছু প্রশ্ন আছে। বিশেষ করে আমার কাছে।

—যেমন?

—এক, ধরো, ওই কঙ্কালদুটো পাওয়া যায় মাটির প্রায় দশ ফুট নীচে। কেউ কি অতোটা নীচে বডি লুকিয়ে রাখবে? বিশেষ করে লুকোনোর সময় যখন কম পাওয়ার কথা। মনে রাখতে হবে দুই যুবরাজের পক্ষেও অনেক লোক ছিল। অনেক

শুভানুধ্যায়ী ছিল। দুই, কঙ্কালের বয়স, ১৯৩৩ সালে তখনকার দিনের ফরেনসিকের সাহায্যে বোঝার কোনো উপায় ছিল না। অর্থাৎ তখন তারা জানতে পারেনি যে ওই কঙ্কালদুটো কত পুরোনো। তা ১০০ বছর পুরোনোও হতে পারে, ১০০০ বছর পুরোনো হতে পারে। এখনকার ফরেনসিক কার্বন ১৪ আর লেড ২১০ আইসোটোপের সাহায্যে ওই কঙ্কালের বয়স জানা সহজেই সম্ভব।

—তা তখন এই কঙ্কালের বয়েস বুঝেছিল কী করে?

—আসলে ওই একই জায়গায় ভেলভেটের পোশাকের কিছু অংশ পাওয়া গিয়েছিল। তখন তো আর ইংল্যান্ডে ভেলভেট তৈরি হত না। যে ধরনের ভেলভেট পাওয়া গিয়েছিল সেটা ওই সময়ে ইতালিতে পাওয়া যেত। ওখান থেকে নিয়ে আসা সম্ভব হত, যদিও তা রাজারাজড়া ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। এতটাই মহার্ঘ্য ছিল। এর থেকেই ধারণা করা হয় যে ওটা রাজপুত্রদেরই কঙ্কাল হবে। আর ওই সময়কার হবে।

—তা এতোদিন এ ব্যাপারে কিছু করা হয়নি কেন?

—আসলে রানির আপত্তি ছিল। অনেকবার আরও তদন্তের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে। কিন্তু পাওয়া যায়নি। অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যেতে পারে তো। অবশেষে শেষ বয়সে এসে রানি রাজি হয়েছেন। এই কঙ্কালদুটো ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে একটা বড়ো পাত্রে রাখা আছে। সেখান থেকে নিয়ে আসা হবে আমাদের লন্ডনের ল্যাবে। তারপরে টেস্ট করে দেখা যাবে। আজকেই হাতে পাওয়ার কথা।

—তা ওই দুই রাজপুত্রের নাম কী ছিল?

—পঞ্চম এডওয়ার্ড ও চতুর্থ রিচার্ড। রাজাদের নাম সব ঘুরে ফিরে এক হত আর কী। আমারই সব নাম গুলিয়ে যায়।

—তা দেখো ইংল্যান্ডে থাকতে-থাকতে আমার এখানে একবার ঘুরে যেতে পারো কিনা।

—হ্যাঁ, যাওয়ার চেষ্টা করব। দেখা যাক। কীরকম সময় বার করতে পারি।

আরও কিছু কথার পরে ফোন কেটে দিল অনিলিখা। মন বলছে—নাহ মনের কথা মনেই থাক।

মরগ্যান থেকে ফিরতে-ফিরতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। নেহাত বেলা একটু বেড়েছে। তাই যখন বাড়ির ভেতর ঢুকল, তখনও সাতটা বাজলেও বাইরে আলো আছে। অনিলিখার বাড়িটা পাহাড়ের উপরে। কিছু দূরে নদী। নদীর উলটো দিকের পাহাড়ের ঢালে সার দিয়ে বাড়ি। জানলা দিয়ে দেখল বেশ কিছু বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। বাড়ির পিছনের বাগানে একটা সাদা-কালো লেজঝোলা পাখি সমানে ডেকে যাচ্ছে। দুটো রবিন পাখি বাড়ির পাঁচিলে বসে ঝগড়া করে যাচ্ছে।

কলকাতায় মাকে ফোন করে চট করে এক কাপ কফি তৈরি করে ল্যাপটপে ফের বসে পড়ল অনিলিখা। ডায়েরির বাকি পাতা আগেই স্ক্যান করে রেখেছিল। বাকিটা পড়তে আর তর সইছে না। আবার তাতে চোখ বুলোল ও।

পরবর্তী কয়েকদিন তেমন কোনো কিছু উল্লেখ নেই। হিউ-এর কোনো উল্লেখ নেই, ওই রকম ঘটনারও কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু তার কিছুদিন পরে ৬ মে-এর লেখায় আবার তার উল্লেখ। খানিকটা যেন হঠাৎ করেই লেখা শুরু হয়েছে।

৬ মে ১৯৭১

আজ রাতে হিউ বেশ বকুনি খেল। আসলে ও কিছুতেই উইক্লিফ বোর্ডিং স্কুলে যাবে না। অনেক বোঝানো হয়েছিল। কিন্তু ডিনার টেবিলে এসে আজকে যা অসভ্যতা করল, কাঁটা-চামচ ছুঁড়ে ফেলে যেভাবে উঠে গেল, তাতে ডেভিড বিরক্ত হয়ে ওকে তো প্রায় মারতেই যাচ্ছিল। আমিই বুঝিয়ে শান্ত করলাম। না-হয় ক-দিন বাদেই পাঠানো যাবে। ডেভিডকে এ ব্যাপারে অনেক কিছুই আমি বলি না। ও অঙ্কের ছাত্র। কোনোভাবেই অন্য কোনো প্যারানর্মাল কিছুতে বিশ্বাস করে না।

আমি নিজেও আসলে কখনও চাইনি যে হিউ বোর্ডিং স্কুলে যাক। আমিই-বা ওকে ছেড়ে কীভাবে থাকব জানি না। কিন্তু ওই ছেলেটার কথা ভেবেই ঠিক করেছিলাম, হিউকে এই বাড়িতে আর রাখব না। মাঝে বেশ কয়েকদিন এ-ব্যাপারে লিখিনি। খানিকটা ইচ্ছে করেই। বড় ভয় হয়। আর লিখতে গিয়ে মনের মধ্যে ভয়টা যেন আরও বেড়ে যায়। নিজের অসহায়তা আরও বেশি করে টের পাই।

অনেক প্রশ্ন চলে আসে। কলম থেমে যায়।

গত একমাসে ওই ছেলেটার সঙ্গে হিউ-এর বন্ধুত্ব আরও বেড়েছে। হিউ-এর উপরে সবসময় খেয়াল রাখার জন্য এক গভারনেস রেখেছিলাম। নাম জো পোপ। জো সারাক্ষণ হিউ কী করছে, কেমন আছে, অন্য কারও সঙ্গে মেশে কিনা—এসবের উপরে লক্ষ রাখত। ওর সঙ্গে-সঙ্গেই থাকত। জো-র বয়স চল্লিশের কাছেপিঠে। এ ধরনের কাজে ওর আরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। একই সঙ্গে যথেষ্ট সাহসী। এর আগে স্যার পিটার জেমসের বাড়িতে কাজ করত। ওকে আমি ইচ্ছে করেই ওই ছেলেটার কথা আগে কিছু বলিনি। হতে পারে যে আমিই শুধু দেখি। এ আমারই মনের ভুল। রাতেও হিউ-এর সঙ্গে ও একই ঘরে থাকত। হঠাৎ গত শুক্রবার ভোররাতে, প্রায় চারটের সময় আমাদের ঘরের দরজায় জোর ধাক্কা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। মাঝরাতে দরজায় এরকম ধাক্কা। আমি আর ডেভিড দুজনেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলে দেখি, বাইরে জো দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখে আতঙ্কের ছাপ। আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—রাতের বেলা ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে এসেছিল।

আমি না জানার ভান করে জিজ্ঞেস করলাম—কোন ছেলেটা? চেনা কেউ?

এর আগের ঘটনা জো-এর জানার কথা নয়। জো ফের ভয়ে-ভয়ে বলে উঠল—একটা বাচ্চা ছেলে। মনে হল হিউ ওকে চেনে। কিন্তু কালকের আগে আমি কখনও দেখিনি। কাল হঠাৎ মাঝরাতে শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি হিউ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে একটা ওর বয়সি ছেলে। আমাকে দেখে হিউ চমকে উঠল। ওই ছেলেটা কে আমি জানতে চাইলাম হিউ-এর কাছে। এতো রাতে হঠাৎ কোথা থেকে এলো, কোথায় থাকে, কী জন্য এসেছে—এসব জানতে চাইলাম। এই কথার মাঝে সঙ্গের ছেলেটা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে আলো বেশি ছিল না। তাই দেখতে পেলাম না ভালো করে মুখটা। বাইরে বেরিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না। যেন হঠাৎ হাওয়ায় মিশে গেছে। হিউ ফের শুয়ে পড়ল। কিন্তু আমাকে ওর সম্বন্ধে কিছুই বলল না। তারপর থেকে জেগেই বসেছিলাম। ভোর হতে এসেছি।

আমি জো-কে সঙ্গে নিয়ে হিউ-এর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। হিউ খাটের উপরে ঘুমোচ্ছে। নিশ্চিন্তে।

আমি পরে হিউকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও কিছু স্বীকার করেনি। আমার মনে হয়েছিল এডওয়ার্ড রোজ রাতে আসত। জো ঘুমিয়ে থাকায় টের পেত না। আর

সেজন্যই হিউ সকালে উঠতে চাইত না। রোজ দেরি করে উঠত। সেদিনকেই ডেভিডকে বলে সিদ্ধান্ত নিলাম হিউকে আর এ-বাড়িতে রাখব না। ভালো বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেবো। এমনিতেও এটাই ডেভিডদের পরিবারের রীতি।

জো-ও আর কাজ করতে চাইছে না। হিউকে স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়ার পরে ওকেও আর দরকার হবে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এখন হিউ একদম বেঁকে বসেছে। অনেক চাপাচাপি করতে বলল ও এডওয়ার্ডকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। কিন্তু কে এই এডওয়ার্ড? কবে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে?

১৮ মে ১৯৭১

নাহ, গত কয়েকদিন যা হল, তারপরে আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। ওই ব্যাপারে লিখতে গেলেও ভয় লাগছে। কালকের ঘটনার পরে এও বুঝতে পারছি যে আরও বড় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট শুধু সময়ের অপেক্ষা।

জো আর নেই। এক সপ্তাহ আগে ও মারা গেছে। রাতের বেলা হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু ওর মতো সুস্থ মহিলা যে হঠাৎ এভাবে হার্ট অ্যাটাকে মারা যাবে, এটা আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। সেদিন সকালে অনেক বেলা অব্দি ওর খোঁজ না-পেয়ে শুনি তখনও ও ঘুমোচ্ছে। সন্দেহ হল। পরে ঘরে গিয়ে ডেকে সাড়া পাচ্ছি না দেখে, তখনই ডাক্তার ডাকি। ডাক্তার এসে বলল নাকি ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

ওর অন্ত্যেষ্টির জন্য যা খরচ পড়েছে সব আমরাই দিয়ে দিয়েছি। ওর নিজের দুই ছেলে। তারা এখান থেকে মাইল তিরিশেক দূরে এক ছোট গ্রামে থাকে। ওদের বাবার সঙ্গে। আমার মনে হয় আমরাই ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী। এ বাড়িতে না এলে ও হয়তো আরও বহু বছর বেঁচে থাকতে পারত। জানি-না এই অপরাধবোধ থেকে কিনা, আমি ওর দুই ছেলেরই ইউনিভারসিটি অব্দি পড়ানোর যাবতীয় দায়ভার নিয়েছি। কিন্তু তবু যেন মন খারাপটা যাচ্ছে না। তাহলে কি হিউকে এডওয়ার্ডের সঙ্গে মিশতে না-দেওয়ার জন্যই ওর এই পরিণতি?

ডেভিডকে বলতে, ও-হেসে উড়িয়ে দিল।

এবার কালকের ঘটনায় আসি। কালকে হিউকে নিয়ে আমাদের বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করতে যাওয়ার কথা ছিল। ডেভিড ব্যস্ত থাকায় আমিই ওর সঙ্গে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে ছিল আমাদের ড্রাইভার নীল। আমি গাড়ির সামনে বসেছিলাম। নীলের পাশে। পিছনে হিউ ছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রয়্যালহিলের আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি।

এক লেনের রাস্তা। এখানে মাঝে-মধ্যে রাস্তা এতো সরু যে বাঁক ঘোরার সময় উলটো দিকের গাড়ি রাস্তার মাঝে চলে আসে। তাই দেখেশুনে খেয়াল রেখে চালাতে হয়। কিন্তু নীল অত্যন্ত অভিজ্ঞ ড্রাইভার। আর এটা ওর সম্পূর্ণ চেনা পথ। কিন্তু কী যে হল বুঝলাম না। মনে হল হঠাৎ যেন নীল চমকে উঠল।

আমাদের রোলস রয়েস গাড়িটা একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ের গায়ে জোর ধাক্কা মারল। নেহাত গাড়ি অতো স্পিডে ছিল না। তা না হলে যেভাবে গাড়িটা ধাক্কা মারল পাহাড়ে, তাতে আমরা সবাই মারা যেতে পারতাম। সবার সিট বেল্ট পরা ছিল। আর এ-গাড়িতে এয়ারব্যাগও ছিল। তাই এ-যাত্রায় রক্ষা পেলাম। সামান্য ট্রিটমেন্টের পরে আমাদের সবাইকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল। নীলকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম এতো বড় ভুল ওর মতো অভিজ্ঞ ড্রাইভারের হল কী করে। ও প্রায় দশ বছর ধরে আমাদের গাড়ি চালাচ্ছে। ও একটু আমতা-আমতা করে বলে উঠল—ম্যাডাম, হঠাৎ কে যেন স্টিয়ারিংটা টেনে ধরে ঘুরিয়ে দিল। মনে হল দেখলাম একটা বাচ্চা ছেলে পিছনের সিট থেকে হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিং ধরে টান দিল। এতো তাড়াতাড়ি হল যে ঠিক বুঝতেই পারলাম না। —বলে একটু থেমে ও ফের বলে উঠল—বিশ্বাস করুন ম্যাডাম, আমি নেশার ঘোরে গাড়ি চালাচ্ছিলাম না। সত্যি সেরকমই অনুভূতি হয়েছিল এক মুহূর্তের জন্য। তাও কোনোরকমে সামলে নিয়েছি।

আমি ওকে মুখে কিছু আর বললাম না। ও নিজেও হয়তো বুঝতে পারেনি যে আমি ওকে কোনোভাবে অবিশ্বাস করিনি। তাহলে কি এডওয়ার্ড এতোটাই মরিয়া! হিউকে কিছুতেই এ-বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না?

ডেভিড বিজ্ঞানের বাইরে কিছুই বিশ্বাস করে না। কিন্তু ও আজ মন দিয়ে শুনল। শুধু বলে উঠল—তাহলে না হয় আর কিছুদিন বাদেই হিউকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো যাবে।—কথার ভাবে বুঝলাম ও নিজেও এবার কিছুটা হলেও বিশ্বাস করেছে।

ল্যাপটপে পড়তে-পড়তে হঠাৎ অনিলিখা থেমে গেল। মনে হল সিঁড়ি দিয়ে যেন একটা হালকা পায়ের শব্দ উপরের দিকে উঠে আসছে। কাঠের সিঁড়ি। সামান্য কিছু আওয়াজ হলেও টের পাওয়া যায়। দোতলার পড়ায় ঘরে বসে পড়ছিল। বাড়িতে ওই একা। সিঁড়ির মুখে ওর এই পড়ার ঘর। উঠে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ঘোরানো সিঁড়ি পুরো নীচ অব্দি দেখা না-গেলেও

উপরের বেশ কিছু ধাপ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সিঁড়ির আলো জ্বলছে না। তাই ভালো করে কিছু দেখার উপায় নেই। সিঁড়ির আলো জ্বালতে গিয়েও জ্বালল না। দরজার কাছে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়াল। নাহ, শব্দটা থেমে গেছে। আর শোনা যাচ্ছে না। ফিরে আসছিল। হঠাৎ যেন মনে হল আবার সেই শব্দটা শুরু হয়েছে। একটা হালকা পায়ের শব্দ। আর এবার দ্রুত উপরে উঠে আসছে। হ্যাঁ, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে কীরকম অন্য ধরনের একটা গন্ধ। মাটির, ভিজে মাটির গন্ধ।

হঠাৎ কী মনে হল, ভেতরে ঢুকে এসে পড়ার ঘরের দরজাটা চট করে বন্ধ করে দিল। একটা হালকা ছিটকিনি আছে দরজায়। ও সেটাকে তাড়াহুড়ো করে উপরে তুলে দিল।

খানিক বাদে আওয়াজটা দরজার বাইরে এসে থামল। অনিলিখা স্পষ্ট অনুভব করল বাইরে কেউ আছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অনিলিখা আর তার মধ্যে শুধু এই হালকা দরজার পাল্লা, আর এই দুর্বল ছিটকিনি।

এবারে হঠাৎ করে দরজায় ধাক্কা পড়ল। শুধু আঙুল দিয়ে কেউ যেন আলতোভাবে দরজাটাকে ধাক্কা দিচ্ছে। ছিটকিনিটা কাঁপছে। মিনিটখানেক বাদে-বাদে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। ছিটকিনিটা কাঁপছে। দরজার কাছে গিয়ে চেপে ধরল অনিলিখা যাতে ছিটকিনিটা পড়ে না-যায়।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিল ও নিজেও জানে না। কিন্তু এই ঠান্ডাতেও ও পুরো ঘেমে গেছে। জানলার বাইরে যেটুকু আলো ছিল, সেটা এখন হারিয়ে গেছে। বাইরে পাইনের কালো মাথার উপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। একটা ঘনকালো মেঘ ঠিক সামনের আকাশে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন ঝড়ের আগের স্তব্ধতা।

হঠাৎ ওর চোখ পড়ল কিনে আনা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ডমিটারের উপরে। মেঝেতে রাখা ছিল। একদিনের ঘটনার জন্যই ও আজকেই এটা একটা দোকান থেকে কিনে এনেছিল। প্যারানরমাল উপস্থিতি বোঝার জন্য এটা একটা খুব দরকারি যন্ত্র। এতে ইলেকট্রিক, ম্যাগনেটিক বা মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ধরা পড়ে। ওটা খানিক আগেই প্যাক থেকে খুলে বার করে রেখেছিল। তখন টেস্ট করা হয়নি। কিন্তু যন্ত্রটা যে ঠিক মতো কাজ করছে তা নিয়ে এখন আর কোনো প্রশ্ন নেই। টেস্ট করারও কোনো দরকার নেই। ওর কাঁটাটা এখন আর জিরোতে পড়ে নেই। কাঁটাটা বেশ উপরের দিকে আর সমানে দুলছে।

ঘরের বাইরে এখন একটা পার্থিব শব্দ শুরু হল। সেলফোনটা বাজছে। বিটোভেনের সুরে পিয়ানো রিংটোন। ইস, ফোনটা যদি অন্তত ঘরে থাকত।

ওয়েলসের চেপস্টাও শহরে অফিসের কাজে কয়েকমাস হল এসেছে অনিলিখা। এখানকার কাউকে ও বিশেষ চেনে না।

অফিসে কাজের বেশ প্রেশার। তাই কাজের বাইরে কম লোকের সঙ্গেই মেশার সুযোগ হয়েছে। যা বন্ধু হয়েছে, সব অফিসের। কিন্তু তাদের কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করার একটাই উপায়, ফোন। আর সেটাই এখন ঘরের বাইরে। খুব সম্ভবত শোওয়ার ঘরে রাখা।

যে এসেছিল সে কি চলে গেছে? সে কী চায়?

বাইরের উপস্থিতি সম্পূর্ণ নীরব হলেও ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ডমিটারের কাঁটা বলে দিচ্ছে বাইরেই সে আছে। আর অপেক্ষা করছে অনিলিখার। ভয়ের একটা ঠান্ডা স্রোতে যেন শিরশিরিয়ে উঠল শরীরটা।

কলকাতার বাড়িতে মা আছেন। কলকাতায় অনেক বন্ধুও আছে। সেখানে সবসময় অনেকের মধ্যে থাকে অনিলিখা। এখানে তা নেই। যেরকম নির্জন জায়গা তাতে চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। বেশিরভাগ বাড়ির জানলা-দরজা সবসময় বন্ধ থাকে। আর কাছাকাছি বাড়ির সংখ্যাও খুব কম।

বাইরে এর মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গাছগুলো জোরে দুলছে। দূরে উপত্যকার অন্যপ্রান্তের বাড়িগুলো কুয়াশায় ঢেকে গেছে। শুধু দূরে রাস্তার আলোগুলো তারার মতো তিরতির করে কাঁপছে।

আজকে আর রান্না না করে পিৎজা অর্ডার দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেটারও এখন আর উপায় নেই। আবার বাইরে ফোন বাজছে। দু-দুবার ফোন বেজে থেমে গেল রোজ মাকে ফোন করে অনিলিখা। আজকে তা করা হয়নি। তাই কি মা ফোন করছে? কিন্তু ভারতে এখন অনেক রাত। এসময় নিশ্চয়ই করবে না।

আরেকটাও হতে পারে। অনুন্নত দেশের বাচ্চাদের জন্য একটা সংস্থাকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করে অনিলিখা। সেখান থেকেও হতে পারে।

কিন্তু এখন বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের আর কী উপায়? একটাই। আর সেটা চোখের সামনেই আছে।

ল্যাপটপ খুলে চট করে ফেসবুকে ঢুকল অনিলিখা। অনেকের মেসেজ। নিজে খুব কম সময় ফেসবুকে থাকে বলে বেশিরভাগ সময় ঠিকমতো রিপ্লাইও দেওয়া হয় না। তবু অনেকেই যোগাযোগ রাখে অনিলিখার সঙ্গে। এখানকার তেমন কেউ নেই ওর ফেসবুকে। থাকলেও ও তাদের কী বলবে? মেসেজ করবে যে আমার খুব ভয় লাগছে! জানাবে যে, দরজার সামনে এমন কেউ দাঁড়িয়ে আছে যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এর থেকে হাস্যকর কিছু তো আর হতে পারে না। বিশেষ করে অনিলিখার মতো বিজ্ঞানসচেতন একজনের কাছ থেকে।

কিন্তু তার আগেই ও লক্ষ করল কেউ ওকে ইনবক্সে মেসেজ করছে। অচেনা নাম—রেবেকা বলে। তার কোনো প্রোফাইল ছবিও নেই।

বেশ কয়েকবার ওর নাম টাইপ করল। তার পরে যে-মেসেজটা এলো, সেটা দেখে খুবই অবাক হল অনিলিখা। পরিষ্কার লেখা।

—তুমি ঠিকই ভেবেছ। ওই বুককেসটাকে তুমি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি থেকে বার করে দাও। ওকে বিদেয় করো।

কী লিখবে লিখতে গিয়েও টাইপ করল না অনিলিখা। ফের মেসেজ এলো।

—ও হল অভিশপ্ত বুককেস। ও অনেক পরিবার ধ্বংস করে দিয়েছে। তোমাকেও করবে।

অনিলিখার এই প্রথম মনে হল—প্রথম আলাপেই কাউকে যেন বিশ্বাস করা যায়। হয়তো এ পরিস্থিতিতে না করেও কোনো উপায় নেই। ভয়ে হাত অবশ হয়ে এসেছে। যেন কি-বোর্ডের অক্ষরগুলোও খুঁজে পাচ্ছে না। তবু তারমধ্যেই ও যতটা সম্ভব দ্রুত টাইপ করে বর্তমান পরিস্থিতি জানাল।

উল্টোদিক থেকে খানিকক্ষণ কোনো মেসেজ এলো না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো উঠে দাঁড়াল অনিলিখা। বাইরের দরজায় আবার যেন কেউ আঙুল দিয়ে টোকা মারছে।

—দরজা খুলো না। পারলে এখনই কোনো প্যারাসাইকোলজি এক্সপার্টের সাহায্য নাও। আজকে রাতে কী করবে জানি না। তবে বাইরে যেও না। কোনোভাবেই যেও না। আমি জানি ও কী করতে চাইছে। ও তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।

লিখতে গিয়েও কিছু লিখতে পারল না অনিলিখা। আঙুলগুলো যেন ভয়ে-আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আবার খানিক বাদে ইনবক্সে মেসেজ এলো।

—তবে মনে রেখো ঘরে ভয় পেয়ে বসে থাকলেও চলবে না। ও যদি চায় হয়তো ভেতরেও চলে আসতে পারে। মনকে অহেতুক সান্ত্বনা দিও না এই ভেবে যে তুমি একটা বন্ধ ঘরে নিরাপদে বসে আছো। ও যেখানে থাকে সেখানে গিয়েই তোমাকে হয়তো ওকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে।

—আপনি কে?—অনেক কষ্টে মেসেজ পাঠাল অনিলিখা।

—অনেক পরিচয় চাইলেও জানা যায় না। শুধু তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী মনে রেখো। ধরো তোমারই মতো ওর পুরোনো কোনো শিকার।

উলটো দিক দিয়ে আর কোনো মেসেজ এলো না।

অনিলিখা টের পেল বাইরে আঙুল দিয়ে ধাক্কাটা আবার শুরু হয়েছে।

দরজার দিকে তাকিয়ে ও চুপ করে বসে রইল চেয়ারে। মনে হচ্ছে এবার যেন সঙ্গে কার গলাও শোনা যাচ্ছে। সেই বাচ্চাটার গলা। 'রিচার্ড, রিচার্ড'। তার পরে অস্পষ্ট কিছু কথা। ওই ছেলেটা কি 'রিচার্ড' বলে কাউকে খুঁজছে?

হঠাৎ কী মনে করে শিউরে উঠল অনিলিখা। কী যেন নাম ছিল ওই দুই যুবরাজের—এডওয়ার্ড আর রিচার্ড। তাহলে কি এ সেই এডওয়ার্ড? তার সঙ্গে এই বুককেসটার কি কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে?

মনে খানিকটা জোর এনে ল্যাপটপে এডওয়ার্ড সম্বন্ধে সার্চ শুরু করল অনিলিখা। ঠিক কী হয়েছিল তখন?

চতুর্থ এডওয়ার্ড মারা যান মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর তেরো বছরের ছেলে পঞ্চম এডওয়ার্ডের রাজা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাদের কাকা অর্থাৎ চতুর্থ এডওয়ার্ডের ভাই তৃতীয় রিচার্ড তা হতে দেননি। কিশোর রাজপুত্রের অভিভাবক হিসেবে নিজেকে দাবি করে রিচার্ড তাঁর দুই ভাইপো পঞ্চম এডওয়ার্ড ও তার ভাই রিচার্ডকে টাওয়ার অফ লন্ডনে বন্দী করে রাখেন। ১৪৮৩-এর জুলাই মাস নাগাদ।

ধারণা করা হয় তাদেরকে পরে খুন করা হয় কাকারই নির্দেশে। তবে তার কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। সেই সময়কার কোনো ঐতিহাসিকও এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু লেখেননি। তবে মূল সন্দেহের তীর ছিল তাদের কাকা তৃতীয় রিচার্ডেরই দিকে। আরও অন্য কয়েকজনকে সন্দেহ করা যেত। তার মধ্যে ডিউক অফ বাকিংহাম, ষষ্ঠ

হেনরিও পড়ে। কিন্তু সে যাই হোক, এ রহস্যের এখনও কোনো মীমাংসা হয়নি। ওই সময়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন পলিডর ভারজিল। উনি ইংল্যান্ডের ইতিহাস লেখেন ১৫০৬ সালে। সেই বই 'অ্যাংলিকা হিস্টোরিয়া'-তে উনি অবশ্য তৃতীয় রিচার্ডকেই দায়ী করেছিলেন। লিখেছিলেন যে, রিচার্ড নাকি টাওয়ারের প্রধান পুলিশ কনস্টেবল স্যার রবার্টকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যাতে ওনার দুই ভাইপোকে মেরে ফেলা হয়। তবে রবার্ট সে নির্দেশ পালন করেনি। রবার্টের পক্ষে এতটা নৃশংস কাজ করা সম্ভব হয়নি। পরে অন্য কেউ এই নির্দেশমাফিক কাজটা করে। তবে এ সম্বন্ধে কেউই নিশ্চিত ছিল না। এর সপক্ষে ও বিপক্ষে নানান তথ্য আছে। ঠিক কী হয়েছিল তা অনেকটাই ধোঁয়াশা।

এডওয়ার্ডের কোনো ছবি আছে কি? হ্যাঁ, অয়ারচেস্টারের ম্যালভান প্রিওরিতে ওই সময়ের কাচের উপরে এডওয়ার্ডের একটা ছবি আঁকা আছে। ছবিটাকে খুঁজে বার করতে সময় লাগল না। ছবিটাকে বড় করে সে ছবি দেখে চমকে উঠল অনিলিখা।

এ তো সেই ছেলেটাই। হ্যাঁ, অবিকল সেই মুখ। সেই সোনালি চুল।

এর মধ্যেই হঠাৎ ওর মনে হল ঘরে একটা শীতল উপস্থিতি। এতক্ষণ মন দিয়ে পড়তে গিয়ে খেয়াল করেনি। দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে একটা সরু লম্বা ছায়া অদ্ভুতভাবে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। আর সেটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে কাচের জানলার উপরের জলের ফোঁটায় যেন একটা ছবি স্পষ্ট আঁকা হয়েছে। ওই তো কার যেন চোখ। হাত-পা-ও দেখা যাচ্ছে। ঢিলে পোশাকপরা একটা বাচ্চা ছেলের অবয়ব যেন জানলায় ফুটে উঠেছে। হঠাৎ অনিলিখার মনে হল ও যেন নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। আর একই সঙ্গে সেই আওয়াজটা, সে শব্দটা যেন তীব্র হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন কে ওকে এতো তীব্রভাবে ডাকছে যে সে ডাক আর উপেক্ষা করার মতো নয়।

ও উঠে দাঁড়াল। আস্তে করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ছিটকিনি খুলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরে কেউ নেই। কিন্তু যন্ত্রচালিতের মতো সিঁড়ি বেয়ে ও নীচে নামতে শুরু করল।

নীচে নেমে খানিকটা হেঁটে ডানদিকে ড্রয়িং রুম। দরজা খুলে ও তার মধ্যে ঢুকে এলো। ঘরের মধ্যে আলো নেই। ও নিজেও আর আলো জ্বালল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বুককেসের দিকে। ওই তো সেই ছেলেটা। পঞ্চম এডওয়ার্ড।

ওর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারেও ওর চোখ দুটো যেন বেড়ালের মতো জ্বলছে। মুখটা ভাবলেশহীন। শুধু ঠোঁট নেড়ে কী যেন বলে যাচ্ছে। অনিলিখা যেন ওর অজানা নির্দেশ পেয়ে বুককেসের পিছন দিক দিয়ে বুককেসের মধ্যে ঢুকে গেল। ভেতরের হাইট চার ফুটের মতো। মাথা হেঁট করে ভেতরে ঢুকে গেল অনিলিখা। ছেলেটা এখনও ডাকছে—রিচার্ড, রিচার্ড। আর সে ডাক উপেক্ষা করা যায় না।

ঘুম ভাঙল। কী ভয়ংকর স্বপ্ন! অবাক চোখে উঠে বসল অনিলিখা। এতো অন্ধকার কেন চারদিকে? ও অন্ধ হয়ে যায়নি তো? নাকি এখনও ও ঘুমেরই মধ্যে?

বাতাসে কেমন যেন একটা অন্য ধরনের গন্ধ। পুরোনো কাঠ আর ভিজে মাটির গন্ধ। একটা স্যাঁতস্যাঁতে ঠান্ডা ভাব। নিজের অস্তিত্ব বোঝার জন্য গায়ের উপরে হাত বোলাল অনিলিখা। নাহ, এই তো এখন ও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। শুধু শেষ কয়েক ঘণ্টা যেন হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে হারিয়ে গেছে ওর নিজের সম্বন্ধে খানিকটা অনুভূতি। যেন এই মাত্র একটা পুতুলে কেউ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছে। আর ও নিজেই সে পুতুল। অনিলিখা উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু না, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর উপায় নেই।

এ কোথায় ও? কোনো ঘর? এতো নিচু ঘর? এ ও কোথায় আছে? কলকাতায় নাকি ওয়েলেসে? বাড়িতে নাকি অন্য কোথাও? নাকি এ পুরোটাই আরেকটা স্বপ্নের অংশ? একটা সময়ের বৃত্তের মধ্যে যেন ও হারিয়ে গেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ও বুঝতে পারল ও স্বপ্ন দেখছে না। তবে জায়গাটা ওর চেনা নয়।

এ কোথায় হতে পারে? এরকম চারদিকে কাঠ? অ্যান্টিকের ঘরটা তো এতো নিচু নয়? ঘরের মেঝে ও হাতড়াতে লাগল। আর তখনই একটা হাড় হিম করা অনুভূতি হল। তাহলে যা স্বপ্ন ভাবছিল, তা স্বপ্ন নয়। ও সত্যি নিজে হেঁটে বুককেসের মধ্যে এসে ঢুকেছে। কিন্তু এখান থেকে বেরোনোর পথ?

হামাগুড়ি দিতে গিয়ে হঠাৎ হাতের কাছে কিছু একটা এসে লাগল। তার উপরে হাত বোলানোর পরে ও বুঝতে পারল জিনিসটা কী। একটা হাড়। হাতের হাড়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আঙুলগুলো। একটা অদ্ভুত ভয়ের অনুভূতি গ্রাস করল অনিলিখাকে। চট করে হাত সরিয়ে নিল কঙ্কালের থেকে।

কাঠের উপরে ধাক্কা দিয়ে ও চিৎকার করে উঠল—Anybody there?

বারবার কাঠের উপরে ধাক্কা মারতে লাগল ও। শক্ত মেহগনি কাঠ। বাইরে থেকে যেন কেউ বন্ধ করে দিয়েছে। বেরোনোর কোনো রাস্তা মাথায় এলো না। তাহলে কি বাইরে থেকে ওই কাঠের সুইচটা টেনে দিলে আর কোনোভাবেই বেরোনো যায় না এই লুকোনো চেম্বার থেকে? চারদিকে শক্ত কাঠ। বেরোনোর কি কোনো উপায় নেই? অন্ধকারে কাঠের চারদিক হাতড়াতে শুরু করল অনিলিখা। কাঠের প্রত্যেকটা ইঞ্চি হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোনো গুপ্ত সুইচ আছে কিনা।

কিন্তু না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল ও কতটা অসহায়। আস্তে আস্তে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সময় কমে আসছে।

নাহ, উত্তেজিত না-হয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে। তা না হলে এই কঙ্কালটার মতোই ভবিষ্যৎ হতে চলেছে ওর। এই বুককেসের মধ্যে লুকোনো চেম্বার খুঁজে বার করা সহজ ব্যাপার নয়। আর তাছাড়া পৃথিবীর মধ্যে এতো জায়গা থাকতে হঠাৎ করে এখানেই বা কেউ খুঁজতে যাবে কেন।

অনিলিখা ঠান্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করল। এখানে ও এসেছিল ক্যান্সার স্টেম সেল নিয়ে রিসার্চের কাজে। কাজ প্রায় শেষের দিকে। আর কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে যেত। কিন্তু এখন আর বোধহয় ফেরা যাবে না। আর মাকেও দেখা যাবে না। মা কোনোদিন জানতেও পারবে না অনিলিখার কী হয়েছিল।

আর দেখা যাবে না অনাথ আশ্রমের সেই ছেলেমেয়েগুলোকে যাদের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে অনিলিখাদি। ওদের দৃষ্টিতে অনিলিখাদিই হল সবথেকে সুন্দর মানুষ। ওদেরকে নিয়ে যে নাটকটা এবার করবে বলেছিল পুজোয়, সেটাও হবে না। মনে পড়ছে শনিবারের আসরের কথা। সেই পরিচিত মুখগুলো, সেই হাসিঠাট্টা। হয়তো আরও একশো বছর বাদে এরকমভাবেই পাওয়া যাবে আরেকটা কঙ্কাল। অনিলিখার কঙ্কাল। কীরকম হবে সেদিনের সেই পৃথিবী? কে জানে। অনিলিখার মনে হল বাতাসে অক্সিজেন সাংঘাতিকভাবে কমে আসছে। মাথাও যেন আর কাজ করছে না তাই। আবোলতাবোল অনেক চিন্তা শুরু হয়েছে।

জলতেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছে। কত ঘণ্টা কেটে গেছে কে জানে।

হঠাৎ মনে হল ও একা নেই। আরেকটা কিছু আছে এর ভিতরেই। নড়ছে। লক্ষ করছে ওকে। আরও গভীর একটা ছায়া যেন অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে বসে আছে।

একটা শব্দ শুরু হয়েছে। ধাক্কার শব্দ। কাছেই কিন্তু তবু যেন কত দূর থেকে আসছে। যেন সময়ের ওপার থেকে। বুককেসের ভেতর থেকে কেউ যেন ধাক্কা দিচ্ছে বেরোনোর জন্য। একটা বাচ্চার কান্নাভেজা গলা।—রিচার্ড, রিচার্ড।—বলে কাউকে আবার ফিসফিসিয়ে ডাকছে।

এবারে যে কথাগুলো বলছে সেটা ফ্রেঞ্চে। যেন কারো আর্তচিৎকার—কেউ আছো? খুলে দাও। আমাকে আর আমার ভাই রিচার্ডকে মেরো না। আমি রাজা হতে চাই না। আমি শুধু বাইরে যেতে চাই। বাঁচতে চাই। আমাকে শুধু একবার বেরোতে দাও। আমি আমার ঘোড়া কোকোর পিঠে চড়ে রিচার্ডকে নিয়ে দূরে—বহু দূরে চলে যাব। ওই পাহাড় আর মেঘের দেশে। আর ফিরব না।

বাচ্চাটা কাঁদছে, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। আর তাকে দেখা না গেলেও, অনুভব করা যাচ্ছে।

কাঠের মেঝেতে হাতড়াতে-হাতড়াতে থেমে গেল অনিলিখা। যেখানে ওই হাড়গুলো পড়েছিল, সেখানে যেন কার হাত অনুভব করল ও। ঠান্ডা বরফের মতো হাত। কিন্তু রক্ত মাংসের। কঙ্কালে মাংস ফিরে এসেছে।

—কেমন আছো? শুনতে পাচ্ছো?

কথাটা যেন অনেক দূর থেকে একবার কানে এলো। আবার হারিয়ে গেল। আবার অন্ধকার। আবার যেন স্বপ্ন।—কেমন আছো? চোখটা খুলে রাখার চেষ্টা করো।

জ্ঞান ফিরতে অনিলিখা আস্তে-আস্তে টের পেল, ও হাসপাতালে। ওকে ঘিরে বেশ কয়েকজন ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে। যদিও সব কিছুই যেন কীরকম ঘোলাটে।

তার মধ্যে একটা মুখ যেন চেনা লাগছে। কিন্তু নামটা মনে করতে পারল না অনিলিখা। এ যেন একটা স্বপ্ন থেকে আরেকটা স্বপ্নে যাত্রা। আবার চোখ বুজে ফেলল।

অনিলিখা সুস্থ। আজকে সকালেই বাড়ি ফিরে এসেছে। তাই বাড়ি জমজমাট। অফিস থেকে কয়েকজন এসেছে ফুল-চকোলেট নিয়ে। গ্যারিও এসেছে।

অন্য সবাই চলে যাওয়ার পরে কথায়-কথায় গ্যারি বলে উঠল—ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে যে দুটো কঙ্কাল রাখা ছিল, লেড টেস্ট করে দেখা গেল দুটোরই বয়স প্রায় এক। সাড়ে পাঁচশো বছরের মতো। অর্থাৎ একই সঙ্গে মারা গিয়েছিল। এ পর্যন্ত গল্পটা মিলে গিয়েছিল। দুটোরই এর পরে ডি.এন.এ. টেস্ট করা হয়েছে। এখানেই চমক। দুটোর মাইটোকনড্রিয়াল ডি.এন.এ. সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ ওদের মা এক নয়। কোনোভাবে সম্পর্কিতও নয়। দাঁত পরীক্ষা করে দেখা গেছে দুজনের বয়সও কাছাকাছি। তবে দুটোর মধ্যে একজন ছোট। রাজপুত্র, রিচার্ডের মনে করা হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গের জনকে বোঝা যাচ্ছে না। রিচার্ডেরও এডওয়ার্ড-এর মতো একই দাঁতের রোগ ছিল। যদ্দুর মনে করা হচ্ছে, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ কোনোরকম বিষ ওদের দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু রিচার্ডের দাদার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

—এডওয়ার্ড-এর?

—হ্যাঁ, কোনো খোঁজই মেলেনি। তবে আমাদের হাতে টমাস মুরের একটা লেখা এসেছে। তাতে উনি যা লিখেছেন, তা খুব ইন্টারেস্টিং। লিখেছেন ওদের কাকা রিচার্ড যখন ওদের মেরে ফেলার আদেশ দেয়, তখন এক বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী ভাবী রাজা পঞ্চম এডওয়ার্ডকে যেকোনোভাবে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। তাই তাকে বাঁচাতে ওই টাওয়ারের মধ্যেই কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল যাতে রিচার্ড-এর লোকেরা খুঁজে না পায়। কিন্তু একথা পরে জানতে পেরে রিচার্ডের অনুগত লোকেরা ওই কর্মচারীকে মেরে ফেলে। এডওয়ার্ডকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল তা কোনোভাবেই জানতে পারে না। পরে এডওয়ার্ড-এর ভাই রিচার্ডকে মেরে ফেললেও এডওয়ার্ডকে ওরা তাই মারতে পারেনি। খুঁজেই পায়নি আসলে। এডওয়ার্ড-এর পরে কী হয়েছিল তার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ওরা রাজপুত্র রিচার্ডকে ও আরেকজন ওরই সমবয়সি বাচ্চাকে, যে খুব সম্ভবত রিচার্ডেরই বন্ধু ছিল, মেরে পুঁতে ফেলে সিঁড়ির নীচে। সবাইকে জানানো হয় যে দুই রাজপুত্রকেই মেরে ফেলা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে সিংহাসনের জন্য কোনো দাবিদার না-থাকে। কিন্তু মজার কথা কেউই এতো বছর পরেও জানতে পারেনি ওই কর্মচারী এডওয়ার্ডকে কোথায় ঠিক লুকিয়ে রেখেছিল। আর তারপরে কী হয়েছিল।

একটু থেমে থাকল অনিলিখা। বলে উঠল—তুমি জানতে চাও কোথায় ওকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল?

হেসে উঠল গ্যারি।—তাহলে তো গত পাঁচশো বছরের একটা বড় মিসট্রি সলভ হয়ে যেত। কেউ যেটা জানল না, তুমি কী করে সেটা জানলে?

—ওকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তা বলি। তুমি হয়তো বিশ্বাসও করবে না। ওকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল একটা বুককেসে। খুব সম্ভবত ওটা তখন টাওয়ার অফ লন্ডনেই ছিল। আর আমি নিশ্চিত যে বুককেসে ওকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সে বুককেসই ঘটনাচক্রে অনেক হাত ঘুরে আমার কাছে আসে। আমাকে তোমরা সেই একই বুককেসের লুকোনো চেম্বার থেকে উদ্ধার করেছ। আমি যা বলছি সেটা যে সত্যি, তার প্রমাণ পুলিশও খুব শিগগিরি পেয়ে যাবে। তোমরা আমাকে যেখান থেকে খুঁজে পেয়েছো, সেখানে যে কঙ্কালটাও ছিল, সেটাই হল পঞ্চম এডওয়ার্ডের কঙ্কাল।

—কঙ্কাল? কই, তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় বুককেসের মধ্যে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে তো আর কিছু ছিল না। সেখানে আবার কঙ্কাল কোথায়? তবে তুমি ঢোকার একটা জায়গা বার করেছিলে বটে। এক্সপার্ট ইনভেস্টিগেশন টিমেরও ওই জায়গা খুঁজে বার করতে একদিন লেগে গিয়েছিল। কিন্তু ওরা কোনো কঙ্কাল তো পায়নি।

—মানে? তোমরা ভালো করে খুঁজে দেখেছিলে?

—দেখেছিলাম মানে? ওটার প্রত্যেকটা ইঞ্চি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে। কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি।

কিন্তু তার আগে বলো তো, ওরকম একটা জায়গায় গিয়েছিলে কেন?

অনিলিখা চুপ করে থাকল। তারপরে বলে উঠল—কিন্তু তোমরা ওই জায়গাটা আন্দাজ করলে কী করে? ওটা বার করা তো সহজ ছিল না। আমার যে বিপদ, আমি যে ভিতরে বন্ধ আছি—সেটা জানলে কী করে?

—একজন অজানা লোকের ফোন থেকে পুলিশ খবর পায়। সে জানিয়েছিল যে তুমি নাকি তার সঙ্গে ফেসবুকে চ্যাট করছিলে। আর তার সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ করে তোমার দিক দিয়ে মেসেজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। আর তুমি তার আগেই ওকে একটা বিশেষ বিপদে পড়ার কথা বলেছিলে। ওই লোকটাই জানায় যে বুককেসের মধ্যে একটা লুকোনো চেম্বার আছে। সেখানে তোমাকে খুঁজে

পাওয়া যেতে পারে। তবে কীভাবে ওই লুকোনো চেম্বার খুঁজে বার করা যেতে পারে তা কিন্তু ওই লোকটা বলতে পারেনি।

—লোকটার নাম কী?

—ওই তো কী যেন? ডেভিড না কী বলেছিল। পুলিশের কাছে সব তথ্য আছে।

—তা তুমি নিশ্চিত যে বুককেসে আর কিছু পাওয়া যায়নি?



—না, বললাম তো। ওটা তো এখনও পুলিশের কাছেই আছে। না হয়, আবার খুঁজে দেখা যাবে। কিন্তু কোনো কিছু থাকার চান্স প্রায় নেই বলতেই পারো।

রাত হয়ে এসেছিল। আরও কিছু কথা বলার পরে গ্যারি বেরিয়ে গেল। ওর এখন একঘণ্টা ড্রাইভ করে যেতে হবে। বাইরে গিয়ে বিদায় জানিয়ে বাড়িতে ফিরে আসছিল অনিলিখা।

সন্ধে হয়ে এসেছে। তবে এ-ক'দিনে ঠান্ডাটা একটু কমেছে। একঝাঁক হাঁস মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ উল্টোদিকের বাড়ির থেকে বৃদ্ধ প্রতিবেশী ভদ্রলোকের গলা শুনতে পেল অনিলিখা। হাত দেখালেন। মনে হয় কিছু বলতে চান। তারপরে রাস্তা পার হয়ে কথা বলতে এগিয়ে এলেন। হাতে একটা বড় ক্যাডবেরি চকোলেট।

অনিলিখা ভাবল হয়তো ভদ্রলোক সব খবর পেয়েছেন। আর তাই অনিলিখা কেমন আছে তা জানতেই এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে বলে উঠলেন—তোমার বাড়িতে যে সোনালি চুলের বাচ্চা ছেলেটা এসেছে, কে হয় তোমার? ভারী মিষ্টি

ছেলে। কী সুন্দর চোখদুটো। এই খানিক আগেও ড্রয়িং রুমের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল, ওকে এই চকোলেটটা দিও।

অনিলিখা ইতস্তত করছে দেখে ফের বলে উঠলেন—না, না, প্লিজ নাও। আমার নাতি তো ওরই বয়সি। গত কয়েকদিন ধরে রোজ ওরা সন্ধের পরে একসঙ্গেই খেলে।

অনিলিখা ধন্যবাদ জানিয়ে চকোলেটটা নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল। এই ভয়ের মধ্যেও ওর হাসি পেলো। ছেলেটা কি আগে কখনও চকোলেট খেয়েছে?

সমাপ্ত

অভিজ্ঞান খুব ভালো গল্প-বলিয়ে। ওর হাতে রয়েছে চমক দেওয়ার মতো অজস্র প্লট—একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো মিল নেই। পড়তে বসলে বঁড়শি-গাঁথা মাছের মতো অবস্থা হয়। প্লটই অভিজ্ঞানের গল্পের আসল 'অভিজ্ঞান'।—**অনীশ দেব।**

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় রেডিওতে 'আসছে সে আসছে'তে গল্প পড়ার সময় বলেন—'অভিজ্ঞানের গল্পে মানবিকতার ছোঁয়া, আর বিচিত্র বিষয়কে অসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তুলে ধরা আমাকে ভীষণভাবে স্পর্শ করে। পটভূমিকা যাই হোক না কেন রহস্যের বুনোট ভারী চমৎকার। আর বিশ্লেষণ সবই নিখুঁত। চরিত্রগুলো এতো জীবন্ত মনে হয় এই বুঝি ছুঁয়ে ফেলবে আমাকে। অভিজ্ঞানে আমি অভিভূত।'

